স্টেট কাউন্সিল সভার আহ্বান

দমবন্ধ করা পরিস্থিতির পরিবর্তনই আমাদের মূল লক্ষ্য

গত ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় ভবন কার্যালয় 'কর্মচারী ভবনে'র অরবিন্দ সভাকক্ষে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক কমিটি স্টেট কাউন্সিলের সপ্তম সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সভা পরিচালনা করেন অশোক পাত্র, চন্দন ঘোষ, চুনীলাল মুখার্জী এবং কৃষ্ণা বসুকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভায় শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন অশোক পাত্র।

সভায় মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজকান্তি গুহ। প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে তিনি বর্তমান পরিস্থিতি, সাংগঠনিক অবস্থা, বিগত কর্মসূচীগুলির মূল্যায়ন এবং আগামী কর্মসূচী ও কর্মচারীদের ভূমিকা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সামনেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগ্রাম উপস্থিত হয়েছে। যেখানে কর্মচারীদের প্রত্যেককে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে হবে। নিজেদের ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে কর্মচারীসহ সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন যন্ত্রণার অবসান ঘটবে না। বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়ার শক্তি মিলিতভাবে এই সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। মানুষ প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন।

প্রস্তাব উত্থাপন করছেন
সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ

জবাবী ভাষণ দিচ্ছেন যুগ্ম-সম্পাদক
অসিত কুমার ভট্টাচার্য

তিনি বলেন, দেশ জুড়ে এক ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছে। কেন্দ্রের সরকার তাদের ফ্যাসিবাদী নীতি সারা দেশের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে। কেন্দ্রের শাসকদল ও সরকারের প্রাণভোমরা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কার্যকলাপের যাঁরাই বিরোধিতা করছেন, তাঁদেরকেই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে। একদিকে উগ্র ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও অন্যদিকে নয়া উদার অর্থনৈতিক নীতি রূপায়ণ করে চলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রের কয়েকটি ঘটনা বিশেষত দিল্লীর জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সভাপতি এবং গবেষক কানহাইয়া কুমারের উপর কোনো প্রমাণ ছাড়া দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁকে জেলবন্দী করা হয়েছে এবং শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা হয়েছে। আর এস এস এবং তার শাখা সংগঠনগুলির লক্ষ্যই হল দেশের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির দখল নেওয়া এবং তাদের দর্শন শিক্ষালয়গুলির উপর চাপিয়ে দেওয়া। গোটা দেশের মানুষ এই ঘটনায় ধিক্কার জানাচ্ছেন। রাষ্ট্র সরাসরি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করছে। আমাদের রাজ্যের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সদর্থক ভূমিকা পালন করলেও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শাসকদলের নেতার ভূমিকা পালন করেছেন। রাজ্যের শাসকদল গোপনে কেন্দ্রের সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করে চলছে। আমাদের রাজ্যের অবস্থাও ভয়াবহ, এখানে মানুষের বাক্ স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। প্রতিবাদ-প্রতিরোধের নানা রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। স্থানীয়ভাবে প্রতিবাদের মঞ্চ তৈরি হচ্ছে, আবার স্থানীয় মঞ্চগুলি বৃহৎ মঞ্চ গঠন করে প্রতিবাদে শামিল হচ্ছে। মানুষের মতো বাঁচতে হলে, অধিকার নিয়ে বাঁচতে হলে এই পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করতে হবে। পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করার জন্য এই সরকারকে উৎখাত করতে হবে।

সংগ্রাম-আন্দোলন প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, সদ্য এক ঐতিহাসিক সমাবেশ সংঘটিত হয়েছে। সারা রাজ্য থেকে হাজার হাজার কর্মচারী ২৮ জানুয়ারির সমাবেশে এসেছেন। গোটা কলকাতা শহর জুড়ে বিশাল বিশাল মিছিল হয়েছে। সাধারণ কর্মচারীরা যে তীব্র ক্ষোভ ও যন্ত্রণা নিয়ে প্রতিদিন চলছেন, ঐ সমাবেশে সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আমরা কর্মচারীদের এই ক্ষোভের প্রকাশ ঘটাতেই চাইছিলাম। অসম্ভব কাজকে আমরা সম্ভব করেছি। গোটা সমাবেশ জুড়ে একটা উন্মাদনা ছিল। অসম্ভব শৃঙ্খলা বজায় ছিল সমাবেশে। স্বেচ্ছাসেবকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। যাঁরা বক্তব্য রেখেছেন সমাবেশে তাঁরাও উদ্বেলিত হয়েছেন সমাবেশের মেজাজ দেখে।

● *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)*

বন্ধ চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের পাশে সহমর্মিতার হাত প্রসারিত করল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

রাজ্যে বন্ধ চা বাগানের শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারবর্গ অসহনীয় কষ্টের মধ্যে রয়েছেন। অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় মৃতের সংখ্যা চারশত ছুঁই ছুঁই। প্রতিদিনই সংবাদ মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের কোনো না কোনো চা বাগানের শ্রমিক বা তার পরিবার পরিজনদের মৃত্যু সংবাদ আমাদের প্রত্যেককে ব্যথিত করছে। এই প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের উদাসীনতা পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। এই অবস্থায় চা শ্রমিক পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গণসংগঠন ও সংস্থা। বন্ধ চা-বাগানে শ্রমিকদের জন্য আর্থিক সহায়তা, রেশনের মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য বিনিময়, ১০০ দিনের কাজ প্রদান—ইত্যাদি সহায়তা নিয়ে দাঁড়াতেই পারত রাজ্য সরকার, যেমনটি করেছিল পূর্বতন সরকার। কিন্তু সেটা ঘটেনি। বরং চা বাগান শ্রমিকরা অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ্য করলো যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই সঙ্কটগ্রস্ত সময়ের মধ্যেই উত্তরবঙ্গে একাধিকবার সফর করলেও চা শ্রমিকদের যন্ত্রণার কথা শোনার সময় করে উঠতে পারেননি। এই চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে নিশ্চুপ থাকতে পারেনি সহমর্মিতার দীর্ঘ ঐতিহ্যের অধিকারী রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। সাহায্য-সহমর্মিতার হাত প্রসারিত করেছে চা বাগান

শ্রমিকদের প্রতি। এই সংগঠনের ইতিহাসেই তো আছে যে এ রাজ্যের আক্রান্ত মানুষই শুধু নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগে যখন ভিন রাজ্যেও সাধারণ মানুষ যখন বিপর্যস্ত হয়েছে তখন তাদের পাশেও সাহায্য নিয়ে হাজির হয়েছে এই সংগঠন। কাশ্মীরের মানুষ, গুজরাটের মানুষ যখন ভূমিকম্পে আক্রান্ত, ওড়িশার মানুষ যখন ঘূর্ণীঝড়ে আক্রান্ত তখন তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। তামিলনাড়ুতে ২০০৩ সালে যখন সরকারী কর্মচারীরা আন্দোলন করতে গিয়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার রোষে পড়ে বরখাস্ত হয়েছেন তখনও তামিলনাড়ুর লক্ষাধিক বরখাস্ত কর্মচারীরা পাশে দাঁড়িয়েছে আমাদের প্রিয় সংগঠন। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও যখন মানবাধিকার আক্রান্ত, জনগণ নিপীড়নের শিকার হয়েছে তখনও কিউবা, প্যালেস্তাইন ইত্যাদি দেশের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়েছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি।

সহমর্মিতার এই ঐতিহ্যের পতাকা বহন করে যে সংগঠন, সে চা-বাগান শ্রমিক-পরিবারের মানুষ জনের এইরকম অসহায় মৃত্যুবরণ মেনে নেবে না এটাই স্বাভাবিক। তাই ২৬টি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের যে যৌথ মঞ্চ বন্ধ চা বাগান খোলার দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে সেই অন্দোলনকে সমর্থন করেই থেমে থাকেনি রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি পাশাপাশি বন্ধ চাবাগান শ্রমিকদের সাহায্যার্থে ১০ টাকার কুপন সংগ্রহের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। তাতে দলমত নির্বিশেষে অভূতপূর্ব সাড়া দেন কর্মচারীবৃন্দ। অসংখ্য আধিকারিক ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। প্রাথমিকভাবে

সংগৃহীত অর্থ দিয়ে সাহায্যের সামগ্রী কিনে আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের মধু চা বাগানের সহস্রাধিক পরিবারকে প্রদান করা হয়। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য আলিপুরদুয়ার জেলা নেতৃবৃন্দ এবং যৌথ আন্দোলনের নেতৃত্ব আলোচনা করে চা বাগানটি নির্দিষ্ট করেন। বিগত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ কলকাতা থেকে সাধারণ সম্পাদক মনোজকান্তি গুহর নেতৃত্বে ১৫ জনের একটি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল সেখানে উপস্থিত হয়ে সাহায্য তুলে দেন আক্রান্তদের হাতে।

সাহায্য পৌঁছল শ্রমিকদের হাতে

কর্মসূচীটি ছিল সকাল ১১টা থেকে। নির্ধারিত সময়ের বেশ খানিকটা আগেই সহযোগিতার সামগ্রী বোঝাই লরি নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা উপস্থিত হন মধু নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে। এইখানেই কর্মসূচীটি অনুষ্ঠিত হয়। একই সাথে উপস্থিত হন জেলা নেতৃত্ব, শতাধিক কর্মচারী এবং ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ। কর্মসূচী স্থলে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গেই এলাকার মানুষজন এবং বন্ধ চা বাগান শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারবর্গ সকলকে সাদরে গ্রহণ করেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যালয়ের সম্মুখস্থ বৃহৎ প্রাঙ্গন লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। ইতিমধ্যে পার্শ্ববর্তী তিনটি জেলা কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং থেকে নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হন।

● *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে)*

দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পাশে

দেখুন আমি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, যদি আর একটা খাতা বেশি দেন আমার খুব উপকার হয়।" "আমি ক্লাস নাইনে পড়ি যদি কয়েকটা খাতা বেশি দেন লেখাপড়ায় একটু সুবিধা হবে"—উপস্থিত কয়েকশো ছাত্রছাত্রীর এইরকম টুকরো টুকরো আর্তি উপস্থিত আমাদের সকলের মনটা নাড়া দিয়ে গেল। চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন ও সাহায্য প্রদানে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির একটি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল, আলিপুরদুয়ার জেলা, মহকুমা ও কালচিনি ব্লকের সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন ব্লকের পঞ্চায়েত সদস্যগণ ও চা শ্রমিকদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী ২৬টি গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। প্রাপ্ত তালিকা অনুযায়ী ৪৭২ জন ছাত্রছাত্রীদের

● *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে)*

সংগ্রামী হাতিয়ার
ফেব্রুয়ারি ২০১৬
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
৪৪তম বর্ষ □ দশম সংখ্যা □ মূল্য এক টাকা

সম্পাদকীয়

মেকী জাতীয়তাবাদের স্বরূপ

প্রয়াত জননেতা এবং রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বিভিন্ন সভা সমাবেশে একটি কথা প্রায়শই বলতেন, এবং তা হল, ভারতীয় জনতা পার্টি বা বি জে পি একটি অসভ্য-বর্বর রাজনৈতিক দল। সাংবাদিকরা যখন তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করতেন যে, আপনি বি জে পি-কে এইভাবে আক্রমণ করছেন কেন, তখন জ্যোতি বসু বলতেন—যে দল ধর্মের জিগির তুলে পাঁচশো বছরেরও বেশি পুরানো একটি সৌধ ভেঙে দিতে পারে, তাদের এছাড়া আর কি বলা যায়? বিজেপি সম্পর্কে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর এই মূল্যায়ন যে কতটা সঠিক ছিল, তা আজ সারা দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ উপলব্ধি করতে পারছেন। জ্যোতি বসুর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে করা মন্তব্যের প্রসঙ্গটি, তাঁর প্রয়াণের বেশ কয়েক বছর পর পুনরুল্লেখ করার কারণই হল, সেদিন তিনি যা বলেছিলেন, তার তাৎপর্য যদি সকলে সমভাবে উপলব্ধি করতে পারতেন, অথবা সাময়িকভাবে সতর্ক হয়েও পুনরায় বিস্মৃত না হতেন, তাহলে গুজরাট গণহত্যা (২০০২), খ্রিস্টান মিশনারী গ্রাহাম স্টেইনস্‌কে তাঁর শিশুপুত্রসহ পুড়িয়ে মারার ঘটনা, এম এম কালবুর্গীকে হত্যা, ফ্রিজে গরুর মাংস রাখার অভিযোগ তুলে মহম্মদ আখলাখকে পিটিয়ে হত্যা, হায়দরাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যা এবং জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সভাপতি কানহাইয়া কুমারের গ্রেপ্তার ও শারীরিক নিগ্রহের ঘটনা ঘটত না। শুধু এগুলিই নয়, গত দু দশকে ঘটে যাওয়া এই ধরনের আরও অনেক নৃশংস ঘটনা এড়ানো যেত। রক্ষা পেত বহু নিরীহ মানুষের প্রাণ। কিন্তু তা হয়নি। দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে (যখন থেকে হিন্দু মহাসভার বিজেপি নামে পুনর্জন্ম ঘটেছে) বিভিন্নভাবে এরা সব মানুষকে না পারলেও, অনেক মানুষকে ভুল বোঝাতে, বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়েছে। কখনও ধর্ম আর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভেদরেখাটিকে আড়াল করে, কখনও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের একাংশের বিকৃতিকে সাধারণ প্রবণতা রূপে প্রতিপন্ন করে, আবার কখনও নির্ভেজাল আর্থিক উন্নয়নের বুলি আউড়ে এরা বহু মানুষকে নিজেদের আশে পাশে জড়ো করতে সক্ষম হয়েছে। মধ্যযুগীয় পশ্চাদ্‌পদ চিন্তার সুচতুর প্রসার ঘটিয়ে মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটিকে প্রভাবিত করেছে।

এর মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দুটি স্তরেই (কেন্দ্র এবং রাজ্য) এরা নিজেদের প্রভাবের অনেকখানি অগ্রগতি ঘটাতে পারলেও, তাদের মধ্যযুগীয় মতাদর্শের ফলিত প্রয়োগের জন্য (ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পরিবর্তে হিন্দুরাষ্ট্র) যে নিরঙ্কুশ আধিপত্যের প্রয়োজন, তা সম্ভব হয়নি। তাই গত লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে সুচিন্তিত উপায়ে নির্মাণ করা হয়েছে একটি নতুন প্রজেক্ট—'মসিহা', যার ঝোলায় রয়েছে সর্বরোগহর দাওয়াই। এই 'প্রজেক্ট' নির্মাণের বিপুল ব্যয়ভার বহন করেছে দেশী-বিদেশী কর্পোরেট পুঁজি। কারণ পূর্বতন রাষ্ট্রীয় কর্ণধারের 'মানসিক দৃঢ়তার অভাব', 'সিদ্ধান্তহীনতা'-য় বিরক্ত (যদিও একসময় তিনি ছিলেন কর্পোরেট পুঁজিরই নয়নের মনি) কর্পোরেট পুঁজিও খুঁজছিল একজন 'মসিহা'-কে যিনি হতে পারবেন 'লৌহমানবী' মার্গারেট থ্যাচারের (ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী) পুরুষ সংস্করণ; বাজার সম্প্রসারণের পথে সমস্ত বাধাকে গুঁড়িয়ে ফেলার শক্তিসম্পন্ন। 'গুজরাট মডেল' কর্পোরেট পুঁজিকে প্রাথমিক ভরসা যুগিয়েছিল। তাই 'গুজরাট মডেলের' সফল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তির মধ্যেই তাঁরা খুঁজে পেলেন তাঁদের 'থ্যাচার'-কে। এইভাবে হিন্দুত্ববাদীদের বাসনা আর কর্পোরেট লবির লক্ষ্য এক বিন্দুতে এসে মিলল। তফাৎ শুধু এটুকুই, কর্পোরেট পুঁজি তাদের উদ্দেশ্যকে (আর্থিক সংস্কার) সবটা গোপন করল না। শুধু এটুকু আড়াল রাখল একথা বলে যে, সংস্কার নীতি গ্রহণ ও প্রয়োগ প্রয়োজন মানুষেরই স্বার্থে! কিন্তু হিন্দুত্ববাদীরা তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে (হিন্দু রাষ্ট্র গঠন) সম্পূর্ণ গোপন করে, কর্পোরেট লবির প্রচারকেই সামনে রাখল। তারা বুঝেছিল, শুধু হিন্দুত্বের তাস খেলে তারা এতদিনে যতদূর এগিয়েছে, এর থেকে খুব বেশি এগোনো সম্ভব নয়। কারণ এদেশে ধর্ম নিরপেক্ষতার ভিতটা অনেকটা মজবুত। সমস্ত ধর্মেই ধর্মপ্রাণ মানুষের অভাব নেই এদেশে। কিন্তু সেই ধর্ম তাঁর জীবন যন্ত্রণার উৎস নয়, উপশমের সন্ধান। বরং ক্ষোভ, দুঃখ, না পাওয়ার যন্ত্রণা, অভাব, দারিদ্র সবকিছুর মূলেই রয়েছে দেশের অর্থনীতি। তাই একে কেন্দ্র করে নতুন নতুন প্রতিশ্রুতি, 'মসিহার' হাতের যাদুদণ্ড ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মানুষের সম্মতি আদায় করা অনেকটা সহজ। দ্বিতীয় একটি কারণও ছিল যার জন্য হিন্দুত্ববাদীরা কর্পোরেটদের গেম প্ল্যানকে সমর্থন করেছে। তা হল জনসমাজের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য। একদিকে ক্রমবর্ধমান অ্যাসপিরেশনাল মিডল ক্লাস এবং সমান্তরালে নবীন প্রজন্মের সংখ্যাগত বৃদ্ধি। এই দুই অংশের কাজে ধর্ম পরিত্যাজ্য না হলেও, রুটি-রুজি ছেড়ে হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হবার মতো জরুরি বিষয়ও নয়। বরং ধর্ম তাগা-তাবিজ বেঁধে স্বপ্ন পূরণের মাধ্যমে হতে পারে। তাই হিন্দুত্ববাদীরা নিজেদের মুখ্য এজেন্ডাকে গোপন রেখে কর্পোরেট লবির সাথে গলা মিলিয়ে আর্থিক সংস্কারের জয়গান গেয়েছে। সাময়িকভাবে হলেও রামচন্দ্র অপেক্ষা গুরুত্ব পেয়েছে এল পি জি (লিবারেলাইজেশন, প্রাইভেটাইজেশন, গ্লোবালাইজেশন)।

কর্পোরেট লবি কি হিন্দুত্বাবদীদের মুখ্য এজেন্ডা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল না? ছিল, কিন্তু মাথা ব্যথা ছিল না। কারণ পুঁজি চায় মুনাফার পাহাড়। তার নিচে ধর্ম নিয়ে হানাহানি করা মানুষগুলির মাথার খুলিও যদি চাপা পড়ে থাকে, তাহলেও কি এসে যায়? বরং ধর্ম যদি বিভাজন রেখাটা টানতে পারে, যদি যুযুধান দুই শিবিরে ভাগ হয়ে যায় শ্রমজীবী মানুষ, তাহলে পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক লড়াইটা হয়ে পড়ে দুর্বল। যাতে আখেরে লাভ পুঁজিরই। এইভাবেই দেওয়া-নেওয়ার টাই-আপ হয়েছিল হিন্দুত্ববাদীদের সাথে কর্পোরেট পুঁজির।

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রমাণ করেছে এই গেমপ্ল্যান সফল। 'মসিহা' ক্ষমতায় আরোহণ করেছেন। 'আচ্ছে দিন', 'মেক ইনি ইন্ডিয়ার' মতো গালভরা স্লোগানও বাজারে ছাড়া হয়েছে। কিন্তু এইসব কিছু দিয়ে প্রত্যাশার ফানুসকে খুব বেশি দিন আকাশে ভাসিয়ে রাখা যায় না। হাতে গরম ফলাফল না পেলে তা দ্রুত চুপ্‌সেও যেতে থাকে। এক্ষেত্রেও ঘটছে ঠিক তাই। বছর দেড়েকের মধ্যেই সকলে উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন, 'মসিহা'র ঝোলায় সাধারণ মানুষের জন্য শুধু কথার ফুলঝুরি ছাড়া আর কিছুই নেই। তাই প্রত্যাশার গ্রাফ তো নামছেই, পাশাপাশি বাড়ছে ক্ষোভের পারদ। যার প্রতিফলন ঘটছে বিভিন্ন নির্বাচনে। অতঃ কিম্?

হিন্দুত্ববাদীরা, যাঁরা নিজেদের আদর্শলালিত এজেন্ডাকে লুকিয়ে রেখে কর্পোরেট এজেন্ডায় ভর করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়েছিলেন, তাঁরা নড়ে চড়ে বসেছেন। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন থাকার এই সুবর্ণ সুযোগটিও যদি ব্যবহার না করা যায়, তাহলে আর কবে হবে? তাই হিড্‌ন্ এজেন্ডা এখন সারফেসে চলে এসেছে, তবে কৌশলগত কারণে ভিন্নরূপে।

হিন্দুত্ববাদীদের এযাবৎকালের অভিজ্ঞতা হল, ধর্মের তাস খেলে ধর্মীয় মেরুকরণের প্রচেষ্টা স্থানিক ও স্বল্পস্থায়ী প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। বিপুল অংশের মানুষ তো এতে সাড়া দেনই না, বিপরীতে প্রতিরোধমূলক ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি হয়। তাই এমন একটি বিষয় বেছে নেওয়া দরকার, যার অন্তর্বস্তু হবে ধর্মীয় জিগির, কিন্তু বাইরের খোলসে এমন একটি বিষয়কে রাখা হবে, যার আবেদন অনেক বেশি মানুষকে আবৃত করবে, এমনকি বহু ধর্মনিরপেক্ষ মানুষকেও। বিষয়টি হল 'জাতীয়তাবাদ'। 'জাতীয়তাবাদ' একটি গভীর অর্থবাহী শব্দ, আমাদের দেশে যার শিকড় জড়িয়ে রয়েছে উপনিবেশবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে। কিন্তু জাতীয়তাবাদের সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যার সাহায্যে জনসমাজে জিঘাংসা তৈরি করার নজিরও গোটা পৃথিবীতে কম নেই। এডল্‌ফ্ হিটলারের 'আর্য' জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার হুঙ্কার এই ধরনের উগ্র জাতীয়তাবাদের নজির। সাধারণ পরিস্থিতিতে জাতীয়তাবাদী চেতনা একটি বিশেষ অবস্থায় উগ্রজাতীয়তাবাদী অবস্থানকে সমর্থন করে ফেলে, এমন নজিরও কম নেই।

হিন্দুত্ববাদীরা তাদের সমর্থনের ক্ষয়প্রাপ্ত ভিতকে ধরে রাখার জন্য তাই 'জাতীয়তাবাদ'কে ব্যবহার করা চেষ্টা করছে, এবং বলা বাহুল্য বিকৃত ও সঙ্কীর্ণ রূপে। আগেই বলা হয়েছে, আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদের জন্ম স্বাধীনতা আন্দোলনের গর্ভে। অথচ যাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে কোনো ভূমিকাই ছিল না, তলে তলে যারা ব্রিটিশ রাজশক্তিকে সহযোগিতা করেছে, যাদের তত্ত্ব-গুরুরা 'ব্রিটিশের কাছে মুচলেকা দিয়ে পিঠ বাঁচিয়েছে, আজ তারাই হঠাৎ জাতীয়তাবাদী ভাবনার উদ্বেল হয়ে উঠেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ঘটনাবলী থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়, উগ্র জাতীয়তাবাদীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল ইতিহাসের অপব্যাখ্যা এবং শাসন কাঠামোর প্রশ্নে একনায়কতন্ত্রকে সমর্থন। আমাদের দেশে নব্য জাতীয়তাবাদীদেরও এই দুই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কিন্তু একটা সমস্যাও রয়েছে। শাসন ক্ষমতা থেকে দূরে থেকে অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় সঙ্কটের জিগির তুলে উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রসার যতটা সহজ, রাষ্ট্র ক্ষমতায় থেকে একই কাজ করতে হলে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা, প্রশাসনিক জবাবদিহি, আইনসভায় রাজনৈতিক বিরোধিতা, আন্তর্জাতিক মহলে ভাবমূর্তি বিপন্ন এবং সর্বোপরি অস্থিরতা আঁচ করে আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির প্রস্থান ঘটতে পারে এ আশঙ্কাও রয়েছে। তাই শাসন ক্ষমতায় থেকে উগ্রজাতীয়তাবাদের প্রসারে সন্তর্পণে কাজটা শুরু করা হয় 'মাইক্রো লেভেলে'। ম্যাক্রো-লেভেলে সব কিছু যেন স্বাভাবিক এমন একটা ভাব দেখানো হয়। প্রধানমন্ত্রীর নীরবতার কারণ সম্ভবত এটাই।

আমাদের দেশে শাসন ক্ষমতায় আসীন হিন্দুত্ববাদীরা মাইক্রো লেভেলে এই কাজটা শুরু করার জন্য বেছে নিয়েছে বিশ্ব বিদ্যালয়গুলিকে। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা, কানহাইয়া কুমারকে ভিত্তিহীন অভিযোগে গ্রেপ্তার ও তার উপর আক্রমণ, সংবিধান স্বীকৃত মতপ্রকাশের অধিকারকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা—সবকিছুই 'জাতীয়তাবাদের নামে আদপে ধর্মীয় মেরুকরণের চেষ্টা' (আফজল গুরুর প্রসঙ্গটি টেনে আনার কারণটিই হল তাই) । উগ্রজাতীয়তাবাদীরা সব ক্ষেত্রেই তাদের প্রচারকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়। এখানেও নেওয়া হয়েছে। এক হিন্দুত্ববাদীর মুখ থেকে এমন কথাও বেরিয়েছে—যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কয়েক হাজার কনডোম, কয়েক হাজার সিগারেট ও বিড়ির টুকরো ও শয়ে শয়ে মদের বোতল পাওয়া গেছে।

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নেওয়ার কারণই হল, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই প্রতিষ্ঠানটিতে সব চেষ্টা করেও হিন্দুত্ববাদীরা খুব বেশি জায়গা করে নিতে পারেনি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ঐতিহ্যগতভাবেই বামপন্থার প্রতি ঝোঁক রয়েছে। তাই দেশের অন্যতম সেরা মস্তিষ্কগুলিকে দখল করার জন্য এই মেকি জাতীয়তাবাদী অভিযান। এ রাজ্যেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে একই ষড়যন্ত্রজালের চেহারা জনসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

কিন্তু মাইক্রো-লেভেলে এই পরিকল্পনাও খুব বেশি কার্যকরী হতে পারেনি এখনও, কারণ দেশ জুড়ে প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। এমনকি প্রতিবাদ করেছেন নোয়াম চমস্কির মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীও। ফলে এই মুহূর্তে হিন্দুত্ববাদীদের পরিকল্পনা কিছুটা ব্যাকফুটে। কিন্তু নিজেদের লক্ষ্যপূরণে আবারও এরকম পরিকল্পনা তারা গ্রহণ করবেই এবং সেই প্রচেষ্টাও ধারাবাহিক জারি রয়েছে। তাই আরও বেশি সতর্কতা, আরও বেশি জনমত গঠন করে জনসমাজ থেকে হিন্দুত্ববাদীদের চূড়ান্ত বিচ্ছিন্ন করার কাজটা আমাদের করতেই হবে। □

২ মার্চ ২০১৬

শোক সংবাদ

অরুণ কুমার দাস

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী সমিতি (W.B.M.O.A)-এর প্রাক্তন সহ-সভাপতি ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কলকাতা পূর্বাঞ্চলের প্রাক্তন সম্পাদক কমরেড অরুণ কুমার দাস গত ২৬ জানুয়ারি ২০১৬ দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে জীবনাবসান ঘটে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। পরিবারে তাঁর একমাত্র পুত্র, পুত্রবধু ও স্ত্রী বর্তমান।

কমরেড দাস ২ ডিসেম্বর ১৯৫০ সালে শ্যামনগরে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রয়াত নলিনী রঞ্জন দাস, মাতা প্রয়াত প্রতিমা দাস। পিতা বেলঘরিয়া টেক্সম্যাকো ফ্যাক্টরিতে চাকুরি করতেন। আদি নিবাস চট্টগ্রাম, সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান কমরেড দাস দেশপ্রিয় নগর বিদ্যানিকেতন, বেলঘরিয়ায় শিক্ষা জীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে বি.কম পাশ করেন। পরিবারে তিন ভাই দুই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠ। অসচ্ছল পরিবারের দায়বদ্ধতা থেকেই বি.কম পাশের অল্প কিছু দিনের মধ্যে মোহিনী মিল, ডালডা ফ্যাক্টরিতে কাজ করেন। পরবর্তীতে ১৫ জুলাই ১৯৭৬ সালে গোবরা মেন্টাল হাসপাতালে স্টোর-কীপার পদে সরকারী চাকুরিতে যোগদান করেন।

তৎকালীন আধাফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ধ্যানধারণা তাঁকে বামপন্থী মতাদর্শে আকৃষ্ট করে। যার ভ্রূণাবস্থা ছাত্রজীবন থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। বামপন্থী আদর্শে দৃঢ়চেতা মনোবল নিয়ে সমিতিতে যোগদান ও স্বল্পকালের মধ্যেই সদালাপী, সাহসী, নীতিনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে কর্মচারী সমাজের কাছে পরিচিতি লাভ করেন। পরবর্তীতে একই পদে বদলী হয়ে এন. আর. এস হাসপাতালে আসেন। ৩১ ডিসেম্বর ২০১০ চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

একজন সৎ, সাহসী, স্পষ্টবাদী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি। হাসপাতালে চাকরি করার সুবাদে সমিতি, ভ্রাতৃপ্রতিম ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা থেকে আগত বিভিন্ন স্তরের কর্মী নেতৃত্বদের হাসপাতালে বিভিন্ন পরিষেবার কাজে বিরামহীন ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করতেন।

সংগঠনের কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও দক্ষতার জন্যই শয্যাশায়ী হওয়ার আগে পর্যন্ত দৈনন্দিন দপ্তরে আসা ও সাংগঠনিক কাজে যুক্ত ছিলেন। ৯-এর দশকে তিনি সমিতির অবিভক্ত কলকাতা জেলার যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। পরবর্তীতে ২০০১-২০০৯ সাল পর্যন্ত কলকাতা পূর্বাঞ্চল, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক ছিলেন। ৭৭তম রাজ্য সম্মেলন পূর্ব পর্যন্ত সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য ছিলেন। পারিবারিক জীবনে সাংঘাতিক প্রতিকূলতাকে জয় করেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংগঠনের কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। গত ১৬ জানুয়ারি কলকাতার কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে এই প্রয়াত নেতার স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। □

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রতিপালিত

গত ২১ ফেব্রুয়ারি উত্তর দিনাজপুর জেলা শাখার উদ্যোগে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ''আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কর্মসূচী'' প্রতিপালন করা হয়। শহীদ বেদীতে মাল্যদান, শোক প্রস্তাব পাঠের মধ্য দিয়ে কর্মসূচীর সূচনা হয়। পরবর্তীতে উদ্বোধনী সঙ্গীত, আবৃত্তি পাঠ, বিষয় ভিত্তিক আলোচনা, ক্যুইজের মাধ্যমে কর্মসূচীটি প্রতিপালিত হয়। সঞ্জয় সরকার ''আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য'' বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া সোমা কর, দেবাশীষ দত্ত, প্রমুখ সংগঠনের জেলা নেতৃত্ব আবৃত্তি, সংগীতসহ সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন। সহসম্পাদক শিবেশ সিনহা প্রারম্ভিক বক্তব্যে আজকের পরিস্থিতিতে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। সভাটি পরিচালনা করেন অন্যতম সহ-সভাপতি দীপক পাল। সমগ্র কর্মসূচীতে ৬০ জন কর্মচারী ও কর্মচারীর পরিবারবর্গ উপস্থিত ছিলেন। □

তৃণমূল কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক জোট

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

রাজ্যে ২০১১ সালের মে মাসে পঞ্চদশ বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূল কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর এই জয়কে অভিনন্দন জানিয়ে দক্ষিণপন্থী হিন্দুত্ববাদী সংগঠন আর এস এস-এর রাজ্য কমিটির মুখপত্র 'স্বস্তিকা' ২৩ মে একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে। এখানে বলা হয় যে, "অবশেষে দুঃশাসনের অবসান। গত ৩৪ বৎসর ধরিয়া বাংলার বুকের উপর ফ্যাসিস্ট দলতন্ত্রের যে জগদ্দল পাথর চাপিয়া বসিয়াছিল, রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সেই পাথরকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে। আলিমুদ্দিনওয়ালাদের যে ধরাশায়ী করা সম্ভব, ইহা লইয়া অনেকেরই সন্দেহ ছিল—মার্কসবাদীরা তত্ত্বগতভাবে যে জাতীয়তা বিরোধী এবং ব্যবহারিক দিক হইতে অসামাজিক—বিশ্বের সাম্প্রতিক ইতিহাসে তাহাই প্রমাণিত—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদী সরকার ও ক্যাডারদের অত্যাচারের প্রতিবাদে দায়িত্বশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহারই নেতৃত্বে তৃণমূল জোটের এই বিরাট জয়"। এই উদ্ধৃতিটির মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, হিন্দুত্ববাদী আর এস এস কমিউনিস্টদের জাতীয়তা বিরোধী বলে মনে করে। এরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'কমিউনিস্ট' বিরোধী বলে স্বাগত জানায়। এর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয় যে এই রাজ্যে আর এস এস-বিজেপি'র সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের আদর্শগত মিল রয়েছে। অবশ্য এটি বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়। তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকেই অবস্থান ও প্রায় দুই দশকের রাজনৈতিক কার্যকলাপে এর ভুরি ভুরি নজির রয়েছে।

এক

রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের আত্মপ্রকাশ ১৯৯৮ সালে। রাজ্য কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর পত্তন করেন। জন্মলগ্নের মুহূর্তে এক প্রকাশ্য সভায় তিনি ঘোষণা করেন যে, 'বিজেপি অচ্ছুৎ নয়। নির্বাচন কমিশন যেহেতু তাকে স্বীকৃতি দিয়েছে, তাই বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক দলও বলা চলে না'। এই উক্তির মধ্য দিয়ে আর এস এস-বিজেপি তথা সঙ্ঘ পরিবারের সাথে তার মৈত্রী বন্ধন গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৯৮ সালের দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচনে। এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস-বিজেপি নির্বাচনী জোট তৈরি হয়। এই জোট থেকে বিজেপি একটি আসনে জয়ী হয়। ১৯৯৯ সালে ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে জাতীয় স্তরে বিজেপি'র নেতৃত্বে এন ডি এ তৈরি হলে তৃণমূল কংগ্রেস তার শরিক হয়। এদের হাত ধরে রাজ্যে বিজেপি দুটি সংসদীয় আসনে জয়ী হয়। বস্তুতপক্ষে রাজ্যের সংসদীয় রাজনীতিতে বিজেপির এই প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে।

১৯৯৯ সালে কেন্দ্রে অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে জোট সরকার গঠিত হলে সেই মন্ত্রিসভায় মমতা বন্দ্যোপাধযায় এবং আর একজন তৃণমূল সাংসদ মন্ত্রী হন। এই পর্বে মন্ত্রীত্বের সুযোগ নিয়ে আর এস এস-বিজেপি এবং সঙ্ঘ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গী করে রাজ্যে বিভিন্ন সময় বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ২০০১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে এন ডি এ ছেড়ে এসে রাজ্যে কংগ্রেসের সাথে জোট বাঁধে। কিন্তু ২০০১ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট জয়ী হয়। এর জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 'কংগ্রেসের অন্তর্ঘাত'কে দায়ী করা হয়। আসলে এই দোষারোপ ছিল পুনরায় বিজেপি'র কক্ষপুটে প্রত্যাবর্তনের মহড়া। পরবর্তীকালে তা প্রমাণিতও হয়। ২০০২ সালে গুজরাটে গণহত্যার নায়ক নরেন্দ্র মোদী বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হলে তিনি ফুলের তোড়া পাঠিয়ে মোদীকে শুভেচ্ছা জানান। শেষপর্যন্ত ২০০৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী তাঁর মন্ত্রিসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্থান দেন। তবে রেলমন্ত্রী হিসাবে নয়, দপ্তরবিহীন মন্ত্রী হিসাবে। লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, প্রতিরক্ষা সাজ-সরঞ্জাম ক্রয়ের প্রসঙ্গে যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপি মন্ত্রিসভা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল, সেই জর্জ ফার্নান্ডেজকে অবলম্বন করেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরায় মন্ত্রিসভায় ফিরেছিলেন। যাইহোক কয়েক মাস পর শেষপর্যন্ত তিনি রেল দপ্তর ফিরে না পেলেও, কয়লা ও খনিজ দপ্তরে নিযুক্ত হন। ২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির শরিক ছিল তৃণমূল কংগ্রেস।

নির্বাচনী সমঝোতার ক্ষেত্রে বিজেপিতেই তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। এর একাধিক নজির রয়েছে। যেমন ২০০১ সালে যখন তিনি রাজ্যে কংগ্রেসের সাথে জোট করেছেন, তখন কিন্তু কলকাতা কর্পোরেশন তৃণমূল কংগ্রেস-বিজেপি জোট অব্যাহত ছিল। তৃণমূলী মেয়র সুব্রত মুখার্জীর ডেপুটি মেয়র ছিলেন বিজেপি নেত্রী মীনাদেবী পুরোহিত। শুধু তাই নয়, এই সময় বিভিন্ন নির্বাচন যেমন পঞ্চায়েত, পৌর নির্বাচনের বিজেপি-তৃণমূল কংগ্রেস সখ্যতা রাজ্যের মানুষ দেখেছে। এমনকি প্রকাশ্যে বোঝাপড়া না হলেও অনেক সময় উভয় দলের মধ্যে পরোক্ষ সমঝোতার ইঙ্গিতও পাওয়া গেছে। যেমন ২০১৩ সালের মে মাসে হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর নামে দেওয়াল লিখন হয়ে যাওয়ার পর তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে গোপন আলোচনার ভিত্তিতে বিজেপি তার দলীয় প্রার্থী প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু একে কেন্দ্র করে কোনো কারণ বিজেপি দর্শাতে পারেনি।

বিজেপিকে সাথে নিয়ে এবং বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে রাজ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিশেষত ২০০৮ সালের পর সিঙ্গুর নন্দীগ্রাম প্রভৃতি প্রশ্নে এই দৃশ্য দেখা গেছে।

দুই

বিজেপি-আর এস এস-তৃণমূল কংগ্রেস বোঝাপড়া যে শুধু নির্বাচনী ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল তাই নয়, নির্বাচনের বাইরেও বিশেষত দলীয় ও আদর্শগত স্তরে যে তা সম্প্রসারিত হয়েছিল, তার একাধিক নজির রয়েছে। ২০০৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর আর এস এস-র একটি জাতীয় স্তরের অনুষ্ঠানে রাজধানীতে হাজির ছিলেন তৃণমূল নেত্রী। আর এস এস-র মুখপত্র 'পাঞ্চজন্য'র সম্পাদক তরুণ বিজয়ের লেখা একটি পুস্তক প্রকাশনা উপলক্ষে এই সভা থেকে প্রদত্ত ভাষণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ''যদি আপনারা (অর্থাৎ আর এস এস) এক শতাংশ সাহায্য করেন, তাহলে আমরা কমিউনিস্টদের হারাতে পারব।... আপনারা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। আমি জানি আপনারা দেশকে ভালোবাসেন''। এরপর তিনি আর এস এস নেতৃত্বকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন যে, ''কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা সাথে আছি''। এই পুস্তক প্রকাশ উপলক্ষে সেদিনকার সভায় এইচ ভি শেষাদ্রি, মোহন ভাগবতের ন্যায় কট্টর আর এস এসের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। তৃণমূল নেত্রীর এই বক্তব্যে উৎসাহিত হয়ে বিজেপি'র রাজ্যসভার সাংসদ বলবীর পুঞ্জ এই সভাতেই বলেছিলেন, 'আমাদের প্রিয় মমতাদি সাক্ষাৎ দুর্গা'।

২০০২ সালে গুজরাটে আর এস এস-বিজেপি যে সংখ্যালঘু নিধন যজ্ঞ চালায়, তার ফলে দেশব্যাপী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি হয়। এমনকি এর আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াও ছিল ভয়ঙ্কর। মার্কিন প্রশাসন সহ একাধিক রাষ্ট্র নরেন্দ্র মোদীকে ভিসা মঞ্জুর করতে অস্বীকার করে। ২০০২ সালে গুজরাটের নির্বাচনে এই সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের মধ্য দিয়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি গুজরাটে সরকার গঠন করে। এই সরকারকে ফুলের তোড়া পাঠিয়ে অভিনন্দন জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আদর্শগত প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে মিল না থাকলে এই অভিনন্দন পর্ব সংগঠিত হতে পারত না। এখানেই শেষ নয়, এরকম আরো দু-একটি ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন। ২০০১ সালে গুজরাটে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়। কেন্দ্রে বিজেপি জোট সরকার গুজরাট সরকারের জন্য মুক্ত হস্তে বিপুল সাহায্যের ব্যবস্থা করে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দলীয় সাংসদদের একদিনের বেতন গুজরাটের ত্রাণ তহবিলে প্রদানের নির্দেশ দেন। কিন্তু ঐ একই সময়ে পশ্চিমবাংলার বেশ কয়েকটি জেলা বন্যায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তৃণমূল কংগ্রেস এক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত অবস্থান গ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে যাতে কেন্দ্রীয় সরকার এক পয়সা সাহায্য না দেয়, তার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস প্রাণপণ চেষ্টা চালায়।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, ২০০৬ সালে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি'র সাথে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী সমঝোতা হয়। এরপরই শুরু সিঙ্গুর ইস্যুকে কেন্দ্র করে 'আন্দোলন'। এই নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী আন্দোলনে বিজেপি পরিপূর্ণ মদত দেয়। ২০০৬ সালের ২৫ ডিসেম্বর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্মতলা অনশন মঞ্চে তৃণমূলের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনে হাজির হয়েছিলেন বিজেপি'র তৎকালীন সর্বভারতীয় সভাপতি এবং বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং।

তবে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি সহযোগিতা বা সহমর্মিতার সব থেকে বড় উদাহরণ হল রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদীর শুভেচ্ছা বার্তা। ২০১১ সালের ১৩ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়। পরের দিন আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি নরেন্দ্র মোদীর পরামর্শ 'প্রথম রাতেই বিড়াল মেরে দিন'। এখানে মোদীর উচ্ছ্বসিত মন্তব্য হল 'আদরণীয় মমতাবেন, প্রথমেই আপনাকে আমার অভিনন্দন। আপনার কাছে আমার গগনচুম্বী প্রত্যাশা। কিন্তু প্রথমেই বলি, আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একথাটা বললাম।... আপনি একজন দৃঢ়চেতা মুখ্যমন্ত্রী, আপনার বুদ্ধিমত্তার উপর আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। কিন্তু প্রশাসনে কঠোরতা খুব আবশ্যক। এই কঠোরতা শুরুতেই আপনার কাছ থেকে প্রত্যাশা করি'। পশ্চিমবাংলার জনগণ বিগত প্রায় পাঁচ বছরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি নরেন্দ্র মোদীর এই প্রত্যাশার ফলাফল হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

এখানেই শেষ নয়, তৃণমূল কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠার সময় গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শুভেচ্ছা বার্তার সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের সভায় নরেন্দ্র মোদীর যোগদানের মধ্যে। এই সভায় নরেন্দ্র মোদী বলেন, ''বিকাশের মন্ত্র নিয়ে আমরা এগোচ্ছি। আমাদের সুযোগ দিলে পশ্চিমবঙ্গে দু-গুণ, তিন গুণ ফায়দা হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের উন্নতি করবেন। কেন্দ্র থেকে আমি এই রাজ্যের উন্নতি করবো। আমাদের মাথার উপর প্রণবদা আছেন, উনিও করবেন''। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানিয়ে নরেন্দ্র মোদী আরো বলেন, ''৩৫ বছর ধরে যে দল এই রাজ্যকে শেষ করেছে, সেই দলকে বিদায় করেছেন আপনি। এর জন্য অভিনন্দন জানাই''। অপর একটি নির্বাচনী সভায় মমতা ঘোষণা করেন, ''ইউ পি এ সরকার বিদায় নিক। নতুন সরকার আসবে। তখন কথা বলে ঋণ কাঠামোর পুনর্গঠন করা হবে যাতে কোনো টাকা নিয়ে যাওয়া না হয় তা দেখব''। ২০১৪ সালে ফেব্রুয়ারি ব্রিগেডের সভা থেকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি রাজনাথ সিং ঘোষণা রেখেছিলেন, ''সি পি আই (এম) বাংলার কোষাগারকে চৌপাট করে দিয়ে গেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইউ পি এ সরকারের কাছে তিন বছরের জন্য ঋণ শোধ স্থগিত রাখার যে আবেদন জানিয়েছিলেন তা কেন্দ্রের মেনে নেওয়া উচিত ছিল''।

অনুপ্রবেশকে কেন্দ্র করে উভয় দলের অবস্থানও অভিন্ন। সংসদে অনুপ্রবেশ সম্পর্কে আর এস এসের বক্তব্য একাধিকবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তুলে ধরেছেন। ২০০৫ সালের ৪ আগস্ট অনুপ্রবেশ নিয়ে আলোচনার অনুমতি না হওয়ায় অধ্যক্ষের মুখের উপর কাগজ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অর্থনৈতিক প্রশ্নে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে দারুণ মিল। ১৯৯৮-২০০৪ সালের মধ্যে সংসদে অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব বিনষ্টকারী প্রতিটি পদক্ষেপকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থন করেছিলেন। এই সময় ব্যাঙ্ক, বীমা ব্যবসা সংস্কার, পেনশন বিল অনুমোদন, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সহ সরকারী পরিষেবায় বেসরকারীকরণ, স্পেশ্যাল ইকনমিক জোন গঠন প্রভৃতি অনুমোদন হয়েছে এবং সর্বক্ষেত্রেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থন ছিল। একথা সর্বজনবিদিত যে, ১৯৯৯ সালে বাজপেয়ী সরকার চালু করেছিল বিলগ্নীকরণ দপ্তর। তৃণমূল কংগ্রেস মন্ত্রিসভার শরিক হিসাবে এক সমর্থন করে। ১৯৯৯ সালেই বাজপেয়ী সরকার ভারতের ঐতিহ্যমণ্ডিত পেটেন্ট আইনকেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করে। তৃণমূল কংগ্রেস এর বিরোধিতা করেনি। এইভাবে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মতাদর্শগতভাবে উভয় দল ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

তিন

তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে ঘনিষ্ঠতাকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যে আর এস এস তাদের শাখা বৃদ্ধি করে চলেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে, বর্ধমানে গত তিন বছরে আর এস এস-র শাখার সংখ্যা পাঁচটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে আশিটি হয়েছে। ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হওয়ার সময় রাজ্যে আর এস এস-র ৫৮০টি শাখা ছিল এবং এর অধিকাংশই ছিল নিষ্ক্রিয়। এখন আর এস এস-র শাখার সংখ্যা ৫৮০টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১৪৯২টি। অর্থাৎ বৃদ্ধির হার ১৫৭ শতাংশ। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের শাসনকালে রাজ্যের ৩৪২টি ব্লকের মধ্যে ২৬২টি ব্লকে আর এস এস সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এছাড়া এই সময় তৃণমূল কংগ্রেস ও তার সরকারের সক্রিয়তায় সঙ্ঘ পরিবারের বিভিন্ন সংগঠন যেমন বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, এ বি ভি পি প্রভৃতির শাখা বিস্তার লাভ করেছে। এদের তৎপরতা প্রধানত মিশ্র জনগোষ্ঠী এলাকায়। রাজ্যে এরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে মেরুকরণ করতে চায়।

পূর্বোক্ত প্রেক্ষাপটে একথা বলা চলে যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের শাসনকালে রাজ্যের জনগণের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার, রুটি-রুজিই শুধু বিপন্ন হয়ে পড়েছে তাই নয়, রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পর্যন্ত আজ আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থই এর জন্য প্রধানত দায়ী। তাই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন একদিকে যেমন রুটি-রুজি ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াই তেমনই অন্যদিকে রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে রক্ষা করে ধর্মনিরপেক্ষতার মহান আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার সংগ্রামও বটে। এই লড়াইতে বামপন্থী, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা বিশেষ প্রয়োজন। □

রাজ্যে কৃষকের দুরাবস্থা!

- একদিকে বাজারে মূল্যবৃদ্ধি, অন্যদিকে ফসলের দাম নেই। ঋণের ভারে জর্জরিত হয়ে আত্মহত্যাকারী কৃষকের সংখ্যা প্রায় ২০০।
- লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ধান কৃষকদের থেকে কিনতে পারে নি এই সরকার। বিগত সময়ে এমনটা কখনো হয় নি।
- ঘোষণা ছিল ফাটকাবাজদের রুখবে সরকার। আদতে লাভ বেড়েছে ফাটকাবাজদেরই। আলুর দাম বেঁধে দিয়ে ফাটকা কারবারীদের সুবিধা করে দিয়েছে সরকার। যে 'কাটপিস আলু' (কাটা, ফাটা, খারাপ) অন্যান্য বছর ৮ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়, রাজ্য সরকার তা সুকৌশলে ১৩ টাকায় বিক্রী করিয়েছে।
- জেলাগুলিতে পেঁয়াজ চাষের উপকরণ, মূল বীজ পৌঁছে দিতে পারেনি সরকার। ফলে পেঁয়াজ উৎপাদন কম হওয়ায় পেঁয়াজের দাম হু হু করে বেড়েছে।
- বামফ্রন্ট সরকার ২০০০ সাল থেকে ওয়েদার-বেসড্ গ্রুপ ইনসিওরেন্স স্কীম (ডব্লু জি আই সি এস) চালু করে। এটা আসলে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড না থাকা কৃষক (নন-লোনী ফারমার)-দের জন্য শস্যবীমা। কাঙ্খিত পরিবেশের অভাবে কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে শস্যের ক্ষতি হলে এই বীমার মাধ্যমে কৃষক ক্ষতিপূরণ পেতেন। বর্তমান সরকার গঠনের পরই এই বীমাটি বন্ধ করে দেয়।
- জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশন, রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার মতো কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির বরাদ্দ টাকার অনেকটাই খরচ করতে পারেনি রাজ্য সরকার।
- প্রথমে 'কিষান মান্ডি' ছিল, পরে হল 'কৃষক বাজার', কিন্তু নাম বদলালেও বহুচর্চিত প্রকল্পের হাল ফিরছে না। প্রথমে ৩৪১টি ব্লকে করার ঘোষণা ছিল। এখন বলা হচ্ছে ৯৫টিতে হবে। এখনও কাজে আসল না কোথাও।
- বামফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রায় ১৪ লক্ষ একর জমি ৩০ লক্ষ গরীব ভূমিহীন মানুষের কাছে বণ্টন করা হয়েছিল। বর্তমানে ভূমি সংস্কার বা খাস জমির পাট্টা বিলির কাজ প্রায় বন্ধ। □

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান সরকারের আমলে শিল্পের হাল হকিকৎ

২০১৫ সালের ১৬ জুন কলকাতা হাইকোর্টে বেসরকারী অর্থলগ্নী সংস্থা এম পি এস-র আমানতকারীদের টাকা ফেরত সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলার শুনানী চলাকালীন মাননীয়া প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, "এই পরিবেশে এখানে কোটি কোটি টাকা কে বিনিয়োগ করবে! কেরল, কর্ণাটক থেকেও কেউ আসবে না। কারণ, আমি জানি। মানসিকতা...।" (আনন্দবাজার পত্রিকা ১৭ জুন, ২০১৫)। রাজ্যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে তাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে বলেছিল রাজ্যে, শিল্পে তারা 'সবুজ বিপ্লব' আনবে। পাঁচ বছরের মধ্যে প্রতিটি মহকুমায় অন্তত দশটি করে বড়, মাঝারি শিল্প গড়ার উদ্যোগ নেওয়ার অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার উল্লেখও ছিল সেই ইস্তেহারে। বর্তমান সরকারের আমলে নতুন একটাও শিল্প হয়নি। যে কটির কাজ শেষ হয়েছে সে সবগুলো শুরু হয়েছিল ২০১১ সালের আগে, যখন বামফ্রন্ট সরকারের সময়। গত সাড়ে তিন বছরে রাজ্যে বড় কোনও শিল্প গড়ে ওঠার কাজ শুরুই হয়নি। বিদ্যুৎ দপ্তরের তথ্য এর প্রমাণ দিচ্ছে। ২০১২-১৩ সালে রাজ্যের শিল্প ক্ষেত্রে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ৭৬১২ মিলিয়ন ইউনিট। ২০১৩-১৪ সালে তা নেমে দাঁড়ায় ৭৪৬৭ মিলিয়ন ইউনিটে। ২০১৪-১৫ সালের তথ্য বলছে বিদ্যুতের চাহিদা আরও দুই শতাংশ কমবে। অথচ ২০০৬-২০০৭ সাল থেকে ২০১০-২০১১ সাল পর্যন্ত শিল্প ক্ষেত্রে বিদ্যুতের চাহিদা গড়ে ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এদিকে ছোট ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রেও বিশাল ধাক্কা লেগেছে। ২০০৮-০৯ সালে ৩৮৯৮, ২০০৯-১০ সালে ৭২৯০ এবং ২০১০-১১ সালে ৬০৪১টি ছোট এবং ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপিত হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী কর্মসংস্থান প্রকল্পে। আর বর্তমান সরকারের আমলে ২০১৪-১৫ সালে মাত্র ১১৪৩টি শিল্প সংস্থা এই প্রকল্পের সুযোগ পেয়েছে।

২০১৫ সাল থেকে রাজ্যে শিল্প সামিটের নামে ঘটা করে উৎসব পালিত হচ্ছে। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায় রাজ্যে বিনিয়োগের বন্যা বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু প্রকৃত চিত্র ঠিক তার বিপরীত। ২০১০-২০১১ সালের পর শিল্পোৎপাদনের হ্রাস হয়েছে ৯৭ শতাংশ। ২০১০-১১ সাল থেকে ২০১১-১২ সালে শিল্পোৎপাদন কমেছে ৯৭ শতাংশ। ২০১২-১৩ থেকে ২০১৩-১৪ সালে শিল্পোৎপাদন কমেছে ৮৫ শতাংশ। বর্তমান সরকারের আমলে শিল্পোৎপাদন কমছে দ্রুত হারে। এই তথ্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন যোজনা কমিশনের রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায়। ২০১০-১১ সালে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৮৩ শতাংশ। ২০১১-১২ সালে এক ধাক্কায় কমে হল ৩.৮২ শতাংশ আর ২০১২-১৩ সালে তা হল ৫.৪৮ শতাংশ।

অ্যাসোচেম-এর তথ্য অনুযায়ী একটা রাজ্য কতটা শিল্প বান্ধব তা বোঝা যায় সে রাজ্যে রিয়েল এস্টেট (জমি-বাড়িতে) সর্বপ্রথম বিনিয়োগ বাড়ে এই দেখে। বিনিয়োগকারীরা আসছে জানতে পারলেই জমি বাড়ির বিনিয়োগ বাড়তে থাকে। অ্যাসোচেম বলছে যে এই রাজ্যে ২০১২-১৩ সালে রিয়েল এস্টেটে কোনো বিনিয়োগ হয়নি।

সময়ের নিরিখে রাজ্যবাসীর সামনে বেশ কিছু কথা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। সিঙ্গুরের চারশো একর জমির মালিকরা যে বেশিরভাগই ভুয়ো তা আজ আর কারো অজানা নয়। তৎকালীন আন্দোলনকারীরা কী তা জানতেন না! বিগত সরকারের সময় নন্দীগ্রামের নয়াচরে যে ১২০০০ একর জমিতে কেমিক্যাল হাব হওয়ার কথা ছিল, তা বর্তমান সরকার বাতিল করে দিয়েছে। ২৬০০০ কোটি টাকার যেখানে বিনিয়োগ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল সেই পথ আজ বন্ধ করে দিয়েছে রাজ্যে ক্ষমতাসীন সরকার।

শিল্পের প্রধান চাহিদা হচ্ছে বিদ্যুৎ। এই সত্যটি উপলব্ধি করে বিগত সরকার বাজেটে একটি বড় অংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেয়। কাটোয়ায় যে বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ হওয়ার কথা ছিল তা বর্তমান সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। শুধুমাত্র সিঙ্গুর নয়, রাজ্যের কোথাও কোনো শিল্প গড়ার কাজ করতে দেয়নি এদের জনবিরোধী আন্দোলন। ২০১১ পরবর্তী সময় অর্থাৎ বর্তমান সরকারের সময়কালে মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প রাজ্যে আসার কথাও ভাবেনি। তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উইপ্রো, ইনফোসিসের মতো শিল্প গোষ্ঠীরা রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বলছেন শিল্প মানে "তেলেভাজা, মুড়ি ভাজা, যাত্রা শিল্প ইত্যাদি"।

রাজ্যের প্রধান দুটি শিল্প চা ও পাট শিল্প দুটোই আজ ধ্বংসের মুখে। ৩৫টি চা বাগান আর প্রায় ১৫টি চটকল বন্ধ। এক এক করে আরো চা বাগান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অনাহারে চা বাগানের শ্রমিকরা আত্মহত্যা করছে। আর মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ উৎসব করে বেড়াচ্ছেন। গঙ্গার দু'ধারে গড়ে ওঠা চটকলগুলোতেও প্রায়শই সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কর্মহীন হয়ে পড়ছে হাজার হাজার শ্রমিক। অথচ বর্তমান সরকারের এমতাবস্থায় কোনো ভূমিকা নেই। ২০১২-১৩ সালে রাজ্যবাসী লাগামছাড়া সমাজবিরোধীদের দ্বারা পরিচালিত শ্রমিক ইউনিয়নের শক্তি প্রদর্শন এবং কারখানার ভিতরে কারখানার মালিকের খুন হওয়ার স্বাক্ষী থেকেছে। সরকারের এক্ষেত্রেও নীরবতা প্রমাণ করেছে যে রাজ্যে কলকারখানা বন্ধ করার জন্যই বর্তমান রাজ্য সরকার দায়িত্বপ্রাপ্ত।

মাশুল সমীকরণ নীতি প্রত্যাহারের পর রাজ্যে যে নতুন শিল্পের সম্ভাবনা শুরু হয়েছিল, 'লুক ইস্ট'-নামে যে শিল্প প্রচার শুরু হয়েছিল, তার গোড়ায় কুড়ুল মেরেই এই সরকার ক্ষমতায় এসেছে। সিঙ্গুর থেকে টাটা গোষ্ঠীকে তাড়িয়ে দিয়ে এরা ক্ষমতায় আসীন হয়েছে। শুধুমাত্র সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রাম নয়, রাজ্যে সর্বত্র এদের আন্দোলন শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষের জমি কেড়ে নেওয়া যাবে না—এই স্লোগানে উগ্রপন্থী থেকে মাওবাদী সবাইকে জড়ো করেছিল বর্তমান শাসক দল।

মুখ্যমন্ত্রী শিল্প বিনিয়োগ আনার নামে সরকারী অর্থে বিদেশ যাচ্ছেন। বাণিজ্য নগরী মুম্বাইয়ে শিল্প সম্মেলনের নামে ঘটা করে জলসা বসছে সরকারী খরচে। অথচ উল্লেখযোগ্য কোনো শিল্প বিনিয়োগ এখন পর্যন্ত হয়নি বর্তমান সরকারের আমলে। মুম্বাইতে রাজ্যের শিল্প সম্মেলনে মুকেশ আম্বানী, আদি গোদরেজ সহ দেশের প্রথম সারির কয়েকজন শিল্পপতি উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ফটোসেশনে অংশ নিয়েছিলেন, রাজ্যে বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। কিন্তু শুধু এই পর্যন্ত। বেশ কয়েক বছর কেটে গেলেও ঐ শিল্পপতিদের রাজ্যে শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি।

২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত শিল্প সম্মেলন শেষে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে বলে রাজ্যবাসীকে জানিয়েছিলেন। বিগত এক বছরে ঘোষিত শিল্প প্রকল্পগুলির একটিরও কাজ শুরু হয়নি। রাজ্যবাসীর কাছে বর্তমান সরকারের ভাঁওতাবাজী পরিষ্কার হয়ে গেছে। ২০১৫ সালের শিল্প সম্মেলন যাকে 'গ্লোবাল বেঙ্গল ইনভেস্টমেন্ট সামিট' নাম দেওয়া হয়েছিল তা অনুষ্ঠিত হবার পর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বিনিয়োগের প্রস্তাবের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। তাতে রাজ্য সরকার দাবি করে যে বিনিয়োগ-প্রস্তাবের পরিমাণ ২ লক্ষ ৫০ হাজার ২৫৩ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। ঐ তালিকায় টাটা-হিতাচি, ম্যাটিক্স, রঘুনাথপুরের সিমেন্ট কারখানার মতো বিগত সরকারের সময় আসা প্রকল্পের কথাও বলা হয়েছিল। ছিল কিছু কেন্দ্রীয় প্রকল্প, যেমন সেইলের ৪০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব, সাগর দ্বীপের নিকট গভীর সমুদ্রে বন্দর তৈরির একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প, এবং ৩০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব জাতীয় সড়কে। তালিকায় ছিল দেওচা-পাচামি খনিতে ১২ হাজার কোটি টাকা, হিন্দ মোটরে উপনগরী,

● *(সপ্তম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে)*

গণতন্ত্র কি প্রহসনে পরিণত হবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের

এ রাজ্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র আক্রান্ত। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তাঁর স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা বলে যে কোনো অধিকার কেড়ে নিতে পারেন আবার অন্যায় প্রশ্রয় দিতে অন্যায় অধিকারও পাইয়ে দিতে পারেন। এই রাজ্যেই কার্টুন ইমেল করার জন্য শাস্তি পেয়েছেন অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র। মুখ্যমন্ত্রীর মতে ঐ কার্টুনের মধ্যেই ছিল খুনের পরিকল্পনা। মুখ্যমন্ত্রীর মুখের ঐ কথাতেই অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। সারের দাম নিয়ে প্রশ্ন তোলায় শিলাদিত্যকে মাওবাদী তকমা দিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। ছাত্রী তানিয়া ভরদ্বাজ মিডিয়ার সামনে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করায় তাকেও মুখ্যমন্ত্রীর কোপে পড়তে হয়েছে। পুলিশ হেপাজতে ছাত্র সুদীপ্তর মৃত্যুকে ছোট ঘটনা ও দুর্ঘটনা বলাতে—এই মৃত্যুর তদন্ত আর এগোয়নি। এইরকম বহু ঘটনাই প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। যারা ঘটাচ্ছে সেই সমস্ত আদরের দলীয় দুষ্কৃতীরা তাঁর আদরের 'ছোট্ট ছেলে', 'বাচ্চা ছেলে'। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির গণতন্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে বেআইনী সব নির্দেশের মাধ্যমে। স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ। লুম্পেন বাহিনী ও সমাজবিরোধী দৌরাত্ম্যে শিক্ষাঙ্গন প্রতি নিয়ত রক্তাক্ত হচ্ছে। আক্রান্ত হতে হচ্ছে অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীগণকে। এঁরা দৈহিক আক্রমণ ও লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছেন প্রতিদিন।

তৃণমূল দল শাসন ক্ষমতায় আসার পর, বার বার বলতে শোনা গেছে দলতন্ত্র বরদাস্ত করা হবে না। মুখে এই কথা আওড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজেদের দখলে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে এই সরকার। বহিরাগত দুষ্কৃতীদের নিয়ে গায়ের জোরে রাজ্যের বেশিরভাগ কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ দখল করে নিয়েছে শাসক গোষ্ঠীর ছাত্র সংগঠন। এর জন্য রক্তাক্ত হতে ও খুন হতে হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের। শিক্ষাঙ্গনের সমস্ত নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করে দলতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে এই সরকার। সত্তরের দশকের নৈরাজ্য ফিরে এসেছে এই সাড়ে চার বছরের রাজত্বকালে বাংলার শিক্ষাঙ্গন জুড়ে। চলছে নির্লজ্জ দলতন্ত্র—কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছড়ি ঘোরাতে শাসক দলের নতুন বাহিনী তৈরি হয়েছে 'ওয়েবকুপা'। এদের বিরাট ক্ষমতা, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং কলেজ অধ্যক্ষদের নিয়মিত কুর্ণিশ করতে হয় ওয়েবকুপার মাতব্বরদের।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে 'ওয়েবকুপা'র একটি সভা হয়েছিল ২২ ডিসেম্বর ২০১৩-তে। যেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী। তিনি এই সভাতে ঘোষণা করেছিলেন, যে সমস্ত কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা 'ওয়েবকুপা'-র সদস্য নন তারাই 'হার্মাদ'। শাসক গোষ্ঠীর দাপটে সরে যেতে হয়েছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাস, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুব্রত পাল এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নন্দদুলাল পরিয়া, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অমিতা চট্টোপাধ্যায়কে। গার্ডেনরিচের হরিমোহন ঘোষ কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কথা মনে করলেই বুঝতে পারা যায়, নির্বাচন কিভাবে প্রহসনে পরিণত করা হচ্ছে। সন্ত্রাস, খুন ইত্যাদি করেই একের পর এক ছাত্র সংসদ দখল করে নিচ্ছে শাসক দলের মদতপুষ্ট ছাত্র সংগঠন, ফলে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ভূলুণ্ঠিত হয়েছে এই রাজ্যে।

বর্তমান সরকার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ব্যবস্থা চায় না। তারা চায় না মানুষ স্বাধীনভাবে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করুক। ক্ষমতায় আসার আগে এক রামধনু জোট সৃষ্টি করে, মানুষকে নানা প্রকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, প্রলোভন দেখিয়ে এই সরকার ক্ষমতায় এসেছে। মানুষের মনের মধ্যে এক কৃত্রিম চাহিদা তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। যার প্রতিফলন ঘটেছে ২০১১ সালের বিধানসভা ভোটে। প্রতিটা প্রতিশ্রুতিই লঙ্ঘিত হয়েছে এই প্রায় পাঁচ বছরের মেয়াদকালে। রাজনীতির মঞ্চে আদর্শকে ধারণ করে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে শক্তি প্রসারিত হয়, তা মূলত কলেজ বিদ্যালয়ের আঙ্গিনা থেকে অঙ্কুরিত হয়ে মূল রাজনৈতিক স্রোতকে জীবনীশক্তি যোগায়। তাই পরিবর্তনের বেশ আগে থেকেই এ রাজ্যের মিডিয়ায় একটা শক্তিশালী প্রচারের মধ্য দিয়ে জনমত গঠন করার চেষ্টা হয়েছিল, যে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনীতি বাঞ্ছনীয় নয়। এতে নাকি পঠন-পাঠনের ভীষণ ক্ষতি হয়। পারলে আইন করে একে বন্ধ করা আশু প্রয়োজন—ইত্যাদি, ইত্যাদি। আজ যিনি বেতন কমিশনের প্রধান হয়েছেন, তাকেও দূরদর্শনে বসে এই অভিমত প্রকাশ করতে দেখা গেছে নির্বাচনের আগে। শুধু একজন নয় অনেক পরিচিত ব্যক্তিত্বকে এই অভিমত প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল সেই সময়—যাঁরা আজ তৃণমূল দলের সম্পদে পরিণত হয়েছেন। কারণ তাঁরা জানতেন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ ছাত্র সংসদ বামপন্থীদের দখলে। তাই এই ধরনের একটা প্রচারের বাতাবরণ গড়ে তুলতে পারলে ছাত্র ও অভিভাবককুলের মধ্যে একটা মতবিরোধ গড়ে তোলা যাবে। যার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার সম্ভাবনা থাকবে।

তাই ক্ষমতায় আসীন হয়েই প্রায় সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু করে দেয় শাসকদল। মেরে, ধরে, খুন করে ও ভয় দেখিয়ে তারা প্রায় সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংসদগুলি দখলে নেয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে ক্ষমতার অপব্যহার করতে থাকে। যখন প্রায় সমস্ত অংশে তারা দখল নিয়ে নেয় তখন নানা অছিলায় গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচন তারা বন্ধ করে দেয়। ফলে নির্বাচিত ছাত্র সংসদগুলির মেয়াদ শেষের পরও তারাই ক্ষমতায় থেকে যেতে সক্ষম হয়। ভর্তি থেকে পড়াশোনা, সমস্ত কিছুর উপর এক স্বৈরতান্ত্রিক দখলদারি তারা নামিয়ে এনেছে। এই পরিস্থিতিতে সেই সমস্ত কেষ্ট-বিষ্টুদের আর দূরদর্শনের পর্দায় এই সময়কালে একটি বাক্যও খরচ করতে দেখা যায়নি, বা কোনো সমালোচনা তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি।

সমস্ত নির্বাচিত সংস্থায় নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য এই স্বৈরতান্ত্রিক পথ বেছে নিয়েছে তৃণমূল দল। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করার পর থেকেই আমরা দেখতে পেয়েছি পঞ্চায়েত নির্বাচনে, পৌর নির্বাচনে বা উপ-নির্বাচনগুলিতে ভোট লুঠ করে তাদের জয়কে তারা সু-নিশ্চিত করেছে। শুধুমাত্র রাজ্য সরকারে নয়, রাজ্যে সমস্ত স্তরের ক্ষমতাকে নিজেদের কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টায় অগণতান্ত্রিক পরিকল্পনা তারা শুরু করে। ভোটের মনোনয়ন পেশে বাধা দেওয়া, বিরোধী গোষ্ঠীকে মনোনয়ন পেশ করতে না দেওয়া এবং পুলিশ প্রশাসনকে হাতে নিয়ে তাদের আটকে রাখার চেষ্টা করা। অন্যায় অভিযোগে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়া। ভোটের সময় ব্যাপক রিগিং, ভোট কর্মীদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে না দেওয়া। গণনার সময় গণনা কেন্দ্রে ফলাফল বদলে দেওয়ায় বাধ্য করা সহ সকল প্রকার অনৈতিক পন্থা নিয়েছে তৃণমূল দল। এত জুলুম বাজির পরও যেখানে ক্ষমতা ধরে রাখা যায়নি সেখানে বিরোধী প্রতিনিধিদের উপর ও তার পরিবারের উপর হামলা করা হয়েছে। এই জুলুমের পরও যেখানে জেতা সম্ভব হয়নি সেখানে বিরোধী নির্বাচিত প্রতিনিধিকে খুন করে পঞ্চায়েত সমিতি দখলের নিদর্শন রয়েছে এই সময়কালে।

কো-অপারেটিভ আইনকে বদল করে সমস্ত কো-অপারেটিভ কমিটিগুলিকে ভেঙে দিয়ে পুনর্নির্বাচন করতে বাধ্য করেছে

● *(সপ্তম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে)*

সামনে দিন জোর লড়াই

পরিস্থিতির পরিবর্তন ছাড়া মুক্তি নেই

মনোজ কান্তি গুহ

ভারতবর্ষের মানুষ আজ এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতাসীন হয়েছে। নব্য উদারীকরণের ঘোরতর সমর্থক এবং দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তি আর এস এস-র নির্দেশিত পথে একদিকে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষেত্রকে গৈরিকীকরণের অপচেষ্টা, অপরদিকে নির্বাচনের সমস্ত প্রতিশ্রুতি অগ্রাহ্য করে 'আচ্ছে দিনের' স্বপ্ন দেখিয়ে আজ মানুষের সাথে প্রতারণায় লিপ্ত হয়েছে। অথচ নির্বাচনের আগে গরিব মানুষকে ভালোভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল, বলা হয়েছিল 'বে-রোজগার কো রোজগার মিলেগা', এবং 'সবকে' লিয়ে 'আচ্ছে দিন'-এর স্লোগানে মুখরিত হয়েছিল প্রাক্ নির্বাচনী প্রচার। কিন্তু আজ কোনো সুরাহা জনগণের জন্য করতে পারেনি। বিপরীতে আর এস এস'র নির্দেশ মেনে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। নির্বাচনে জয়লাভের পর থেকে সারা ভারতের নানা প্রান্তে দাঙ্গা শুরু হয়েছে। তথাকথিত জাতীয়তাবাদের নামে চরম উন্মত্ততা তৈরি করা হচ্ছে। মহারাষ্ট্রের লাতুরে একজন পুলিশ কনস্টেবলকে নগ্নভাবে প্রহার করা তাকে আর এস এস পতাকা বহন করতে বাধ্য করা হয়েছে। বিজেপি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ঘোষণা অনুযায়ী গত ১ বছরে দেশে ৬৪৪টি দাঙ্গা হয়েছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সম্মেলনের উদ্বোধন করতে গিয়ে বিশিষ্ট সাংবাদিক সমাজসেবী তিস্তা শীতলাবাদ বলেছেন ''যে, ২ বছর ধরে গভীর আলোচনার মধ্যে দিয়ে ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ সালে যে সংবিধান গৃহীত হয়েছিল তাতে দেশকে একটি গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল জাতি, ধর্ম, ভাষা নির্বিশেষে সমস্ত দেশবাসীর, যাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনো না কোনো ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন সবাইকে দেশ গঠনের কাজে যুক্ত করা। এই প্রচেষ্টাকে আজকে চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলে দিয়েছে এমন একটি শক্তি যাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনো ভূমিকা ছিল না। উপরন্তু তাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন দমনে ব্রিটিশকে সাহায্য করার অভিযোগ আছে। সেই শক্তির নাম রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ।''

আসলে নব্বই দশকের গোড়া থেকে দেশে অনুসৃত জনবিরোধী উদারবাদীর অর্থনীতি আজ পরিণত হয়েছে চরম দক্ষিণপন্থী সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রনীতিতে। এই ভয়ঙ্কর উন্মত্ত শক্তি আজ টার্গেট করেছে দেশের মেরুদণ্ড ছাত্র যুব সমাজকে। বিশেষ করে বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপর চলছে চরম আক্রমণ। হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র (নিম্নবর্ণ সম্প্রদায়ভুক্ত) রোহিত ভেমুলাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের প্ররোচনায় আত্মহত্যা করতে হয়েছে। জে এন ইউ (জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়)-র ছাত্র কানহাইয়া কুমারকে দেশদ্রোহী আখ্যায়িত করে জেলে পুরে রাখা হয়েছে। জেল থেকে পাতিয়ালা হাউস কোর্টে বিচারের জন্য আনার সময় পুলিশের সামনে আর এস এস বাহিনীর নির্মম প্রহারে দারুণভাবে আহত হয়েছেন তিনি। এর প্রতিবাদে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সহ সারা দেশ জুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন চলছে। বর্তমানে সাধারণ মানুষের সাংবিধানিক অধিকার আক্রান্ত। গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেই ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান ঘটে। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি আমাদের সাংবিধানিক অধিকার, ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতির ভিত্তিতে ভারতে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, ঈশাই সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ যাঁরা ভারতের নাগরিক সবার অধিকার সমান। সাম্প্রদায়িক বিভাজনের নীতি প্রয়োগ করা মানে দেশের সংবিধানকে অমর্যাদা করা এবং অমান্য করার সামিল। তাদের বিরুদ্ধেই দেশদ্রোহির মামলা হওয়া উচিত এবং জেলে পোরা উচিত।

আরেকদিকে দেশী বিদেশী কর্পোরেট হাউসকে নানাবিধ সুযোগ দেওয়া এই বিজেপি সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক তথ্য অনুযায়ী দেশের একচেটিয়া বৃহৎ পুঁজিপতিদের ব্যাঙ্ক ঋণ ১ লক্ষ ১৪ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার মকুব করেছে। অথচ এই গরিব দেশের ৬০/৭০ ভাগ মানুষ এখনো কৃষিক্ষেত্র থেকে রোজগার করে বেঁচে আছেন।

বিশ্বায়ন পর্বে কৃষিক্ষেত্রে চলছে মন্দা, তাই সারা বছরে কাজ জোটে না। সরকারের সেদিকে নজর নেই। ১ লক্ষ ১৪ হাজার কোটি টাকা যদি রেগায় বরাদ্দ হতো তাহলে গরিব মানুষগুলিকে বছরে ৩০০ দিনের কাজ দেওয়া যেত। বিশ্বায়ন উদারীকরণের ধাক্কায় ধনী গরিবদের অসাম্য ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। জার্মানীতে হিটলার রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং জাতিবিদ্বেষী প্রচার অভিযান তীব্রতর করে তুলেছিলেন। জার্মান জাতিকেই ফ্যাসিস্টরা একটা উচ্চতর আর্যজাতি হিসাবে মনে করতো আর অন্য সমস্ত মানুষকে নিকৃষ্ট নিচু স্তরের মানুষ ভাবতো। জার্মনারাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি, তাই উচ্চতর জাতিরই অধিকার সমগ্র পৃথিবীর উপর প্রভুত্ববাদ কায়েম করার। তাদের হিংস্রতার চরম নিদর্শন ইহুদিদের নৃশংশভাবে গ্যাস চেম্বারে পুরে হত্যা করা। জার্মান থেকে এবং প্রায় ইউরোপ থেকে ইহুদী হঠিয়ে শুরু করেছিল কমিউনিস্ট নিধন। ফ্যাসিস্টধর্মী কার্যকলাপের ছায়া আজ ভারতে দেখতে পাচ্ছি এবং উপলব্ধি করছি। আর এস এস

চাইছে ভারত থেকে মুসলমান হঠাতে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পরিবর্তে হিন্দুরাষ্ট্র বানাতে চায়। হিন্দু রাষ্ট্রে অন্যান্য সম্প্রদায় থাকলে তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হবে। হিন্দুদের বশ্যতা স্বীকারে তাঁরা বাধ্য থাকবে। আর এই হিন্দুরাষ্ট্রের তীব্র বিরোধিতা করে কমিউনিস্টরা তাই তাদের উপর আক্রমণ হানো।

সম্প্রতি প্রকাশ্য দিবালোকে গৈরিক বাহিনী সি পি আই(এম)-র দিল্লীর কেন্দ্রীয় পার্টি অফিস ভাঙচুর করেছে। পশ্চিমবাংলার একজন বি জে পি নেতা (প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি) প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছেন কমিউনিস্টদের দেখলেই পেটাও। এটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সম্ভব নাকি? সমস্ত পদধ্বনি ফ্যাসিস্ট ধর্মী। দেশের বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা রুজু করা হচ্ছে। যাতে গণতান্ত্রিক কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। মানুষকে বাক্‌রুদ্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই ভয়ঙ্কর বিপদের হাত থেকে দেশকে রক্ষার দায়িত্ব সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের। নাগরিক হিসেবে আমাদেরও সেই দায়িত্ব প্রতিপালন করতে হবে।

কিন্তু এই দায়িত্ব পালনের কাজ পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক পরিবেশকে পুনরুদ্ধার না করতে পারলে সম্ভবপর হবে না। কারণ পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে ভারতবর্ষের সাধারণ মেহনতী মানুষের, মধ্যবিত্ত, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাংস্কৃতিক সর্বোপরি বামপন্থী আন্দোলনের অগ্রবর্তী ঘাঁটি। তাই পশ্চিমবঙ্গকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের কোনো ধরনের মুক্তিকামী আন্দোলন শক্তিশালী হতে পারেনি। শাসকশ্রেণী এই সত্য বোঝে। তারজন্যই ২০০৬ সালে যখন বামপন্থীরা ২৩৫ আসনে জয়ী হয়ে সপ্তম বামফ্রন্ট গঠন করেছিল তখন শাসকশ্রেণী প্রমাদ গুণেছিল এবং তারপর থেকেই শুরু হয় রাজ্য জুড়ে ষড়যন্ত্র। সেই ষড়যন্ত্রের মূল কথা ছিল পশ্চিমবঙ্গের শাসনকার্য থেকে বামফ্রন্টকে হঠাও। এই গভীর ষড়যন্ত্রে কোনো বুর্জোয়া দল বাকি ছিল না। আন্তর্জাতিক শক্তি ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিল, মাওবাদী থেকে তৃণমূল কংগ্রেস, সিদ্দিকুল্লা থেকে গৈরিক বাহিনী, কামতাপুরী থেকে আদিবাসী বিকাশ পরিষদ, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা থেকে গ্রেটার কোচবিহার, কর্পোরেট মিডিয়া থেকে কর্পোরেট চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকা, বুদ্ধিজীবী থেকে গায়ক-গায়িকা সাথে আরো অন্যান্য অংশ এমনকি বামপন্থী বলে দাবি করে এমন কয়েকটি রাজনৈতিক দল। শুরু হয়ে গেল গ্রামস্তরে বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক কাঠামোর উপর আক্রমণ। প্রতিদিন মাওবাদী ও তাদের সহকারীরা বামপন্থী নেতৃত্ব কর্মীকে খুন করতে আরম্ভ করলো। খুনের নৃশংসতা এত বীভৎস হতে পারে গণতান্ত্রিক সমাজ কখনো দেখে নি। পশ্চিম মেদিনীপুরে একজন আদিবাসী বামপন্থীকে খুন করে ফেলে রেখেছে কাউকে মৃত ব্যক্তির কাছে যেতে দেওয়া হয়নি। মৃত ব্যক্তির সৎকার করার জন্য কোনো উদ্যোগ নেওয়া যাবে না। তাঁর বৃদ্ধা মাতার সন্তানকে কাছে গিয়ে শেষ দেখা করার অধিকার নেই। রাতে শিয়াল আর দিনে কুকুর মৃতদেহটিকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে। এই নৃশংসতা সবাই দূর থেকে দেখেছে। তারপর ২০০৮-এর পঞ্চায়েত নির্বাচন, ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচন, ২০১০-এ পৌরসভা-মিউনিসিপ্যালিটি এবং ২০১১ বিধানসভা নির্বাচন সবটাই হয়েছে মানুষকে বিভ্রান্ত করে একটা বড় মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রের উপর ভর করে। তারপর থেকে পরিবর্তনের সরকার ক্ষমতাশীল হয়ে আক্রমণের মাত্রা আরও তীব্র করেছে। আর মাত্র ৩ মাস সময় অতিক্রান্ত হলে বর্তমান স্বৈরাচারী সরকারের ৫ বছর পূর্ণ হবে। এই সরকারের সময়কালে এরাজ্যে এখন পর্যন্ত ১৮১ জন বামপন্থী কর্মী, নেতা, বিধায়ক খুন হয়েছেন। শতাধিক মহিলা ধর্ষিতা হয়েছেন। মানুষের কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার নেই। মিথ্যা মামলায় বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা, কর্মী এবং সাধারণ মানুষকে জেল খাটতে হচ্ছে। একটা বিশাল লুম্পেন বাহিনী তৈরি করা হয়েছে। প্রশাসন থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে আধিপত্য কায়েম করেছে। পুলিশ প্রশাসন সম্পূর্ণত এই লুম্পেন বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। আক্রান্ত মানুষ পুলিশ প্রশাসনের কাছে কোনোরূপ সাহায্য পাচ্ছে না। খুনীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাধারণ মানুষ আজ আতঙ্কগ্রস্ত, সন্ত্রস্ত। মহিলাদের নিরাপত্তা আজ প্রশ্নের মুখে। একটা দমবন্ধ করা পরিবেশ, মানুষ এর থেকে পরিত্রাণ চাইছে। সেজন্যই চারিদিকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখরিত হচ্ছে।

বর্তমানে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। আতঙ্কগ্রস্ত কর্মচারী সমাজ। প্রশাসনের একাংশ আমলার উদ্ধত আচরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। বেছে বেছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যদের উপর প্রশাসনিক সন্ত্রাস চলছে। যখন তখন নিয়ম বহির্ভূত ভাবে কর্মচারীদের বদলী করা হচ্ছে। আমলাদের কাউকে কাউকে দেখলে মনে হয় তৃণমূল রাজনৈতিক দলের কর্মী। তারা আমাদের কর্মচারীদের শত্রু মনে করছেন। এইসব আমলাদের নিশ্চয়ই আমাদের কর্মচারীরা কোনোদিন ভুলবেন না। সময় মতো পুরস্কৃত করবেন। আমাদের বহু কর্মচারীকে জরিমানা দিয়ে অফিস করতে হচ্ছে। ট্রেড-ইউনিয়ন কার্যকলাপ বন্ধ করার অনেক আদেশ প্রদান করেছে রাজ্য সরকার। কিন্তু রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ঠেকাতে পারেনি। খোদ নবান্নতে গিয়ে ২ সেপ্টেম্বর ধর্মঘটের সমর্থনে ইস্তেহার বিলি করা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ভেঙে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। কিন্তু রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ভাঙ্গেনি বরং বিশাল শক্তির প্রদর্শন করেছে গত ২৮ জানুয়ারি কলকাতা রানী রাসমনি এভিনিউতে। প্রশাসনের কোনো সংগঠনের এত আক্রমণ, হুমকি সত্ত্বেও এ ধরনের সমাবেশ করার ক্ষমতা নেই। কেউ ভাববেন না অহঙ্কার করছি। এটা অহঙ্কার নয় গর্ব, কারণ আমাদের সংগঠন রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। প্রতিদিন নানা ধরনের আক্রমণ, নিপীড়ন, মোকাবিলা করেই কর্মচারী সমাজ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সংগঠনের আহ্বানে তাঁরা জেলার বিভিন্ন দুর্গমপ্রান্ত থেকে জীবন-জীবিকাকে বাজি রেখে সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। সরকারকে হুশিয়ারী দিয়ে বলেছে দেখো আমাদের শক্তি, তোমার এই অত্যাচার আর সইবো না। উপযুক্ত জবাব তোমাকে পেতেই হবে। এর জন্য গর্ব করবো না, অবশ্যই করবো।

ভারতবর্ষের কোনো রাজ্যের রাজ্য সরকারী কর্মচারী নেই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মতো পাহাড় প্রমাণ আর্থিক বঞ্চনায় নিমজ্জিত। রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলছি—আপনি ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্‌কালে সোনারপুরের একটি জনসভায় বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারীরা সবচেয়ে কম বেতন পান। আমি যদি ক্ষমতায় আসতে পারি তাহলে সরকারী কর্মচারীদের এই বঞ্চনা দূর করবো, সাথে আরও অনেক প্রতিশ্রুতি। আপনি ২০১১ সালে ক্ষমতায় এসেছেন এবং প্রতিশ্রুতি কি এইভাবে রক্ষা করেছেন? আজকে ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবাংলার কর্মচারীরা সবচাইতে কম বেতন পান। আমরা সৌভাগ্যবান, আপনি যদি ক্ষমতায় না আসতেন তাহলে সরকারী কর্মচারীবৃন্দ এই অকাট্য সত্যটি বুঝতে পারতেন না। কেননা বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ৪টি বেতন কমিশন, কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা, ডি.এ মার্জার, মৃত কর্মচারীর পোষ্যের চাকরি, নতুন নিয়োগে পুরো বেতন, ষাট হাজার অস্থায়ী কর্মচারীকে স্থায়ী করণ, গ্রেড প্রমোশন, ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট, জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে প্রমোশন, হাজার হাজার কর্মচারী স্থায়ী নিয়োগ, বোনাস, এসগ্রাসিয়া ইত্যাদি বহু দাবির সাথে ট্রেড-ইউনিয়ন করার গণতান্ত্রিক অধিকার, ধর্মঘট করার অধিকার, সি সি আর বদলে ও পি আর এত কিছু আমাদের ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যের সাথে তুলনা করা ভুলিয়ে দিয়েছিল। আপনাকে ধন্যবাদ আপনি মনে করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আপনাকে মনে রাখতে হবে ভারতের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় দায়িত্ব দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কেন্দ্রের দায়িত্ব এবং রাজ্যের দায়িত্ব আর একটি হচ্ছে কেন্দ্র-রাজ্যের যুগ্ম দায়িত্ব।

কেন্দ্রীয় সরকার যেমন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, পেনশন, চিকিৎসাসহ সব দায়িত্ব পালন করে তেমনি রাজ্য সরকারের দায়িত্ব রাজ্য কর্মচারীদের প্রতি দায়িত্ব পালন করা। সরকার চালাতে গেলে সরকারী কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, পেনশন, চিকিৎসাভাতা ইত্যাদি সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়। এটা রাজধর্ম পালনের অংশ। আপনি সেই দায়িত্ব উপেক্ষা করছেন। খেলা, মেলা, মাটি উৎসব, পিঠেপুলী উৎসব, মোজাম্মেন ভাতা, ক্লাবকে টাকা দেওয়া, খেয়াল খুশি মতো অর্থ অনুদান দেওয়া অথচ সরকারী কর্মচারীদের হক্ এর অর্থ দিচ্ছে না। এখনো কর্মচারীদের ৫০ শতাংশ মহার্ঘ-ভাতা বকেয়া পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ এখনো কার্যকরী হয়নি। এটা না হলে গত পে-কমিশনের পূর্ণ সুযোগ থেকে

● *(সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)*

মধু চা-বাগানের শ্রমিকদের দুঃখের কথা শুনল সংগঠন

এত অভাবের মধ্যেও বাইরের লোক দেখলে আন্তরিকতার সাথে অন্তত দাওয়াতে বসতে বলছে পরিবারগুলি। নিজেদের দুবেলা দুমুঠো আহার জোটে না। আমাদের সংগঠনের এই সামান্য সাহায্য তাঁদের কাছে অন্ধকার ঘরে এক মুঠো আলোর মতো। এই সাহায্য সামগ্রী খুব বেশিদিন চলবে না। সেটা জানা সত্ত্বেও ওরা আমাদের আপন করে নিয়েছিল। ওদের চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল আমাদের আন্তরিকভাবে গ্রহণ করার ছবি। ওঁরা মানে প্রেমাণি ওরাঁও, দীকসা ছেত্রী, প্রিয়া হিরবাই, গঙ্গা ওঁরাও, কুমারী মায়া প্রভৃতি। ওঁরা অথবা ওঁদের পরিবারের কেউ না কেউ মধু চাবাগানে কাজ করতো, ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাগান বন্ধ হওয়ার আগে। কথা বলছিলাম ওঁদের সাথে, অধিকাংশই মহিলা। বন্ধ চা বাগানের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে ওঁরা ওঁদের যন্ত্রণার কথা বলছিল। বলছিল যে ঐ চা বাগানে কাজ করে পরিবারের একজন যা আয় করতো তা দিয়েই সংসার

চলতো। আজ ওঁরা অসহায়। বাচ্চাদের পড়াশোনা চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। প্রশ্ন করলাম রাজ্য সরকার কি করছে? ক্ষোভে দুঃখে কুমারী মায়া ঘরের ভেতর থেকে একটা চালের পাত্র নিয়ে এল। বলল, সরকার দিয়েছে এই চাল মুখে তোলা যায় না। তাকিয়ে দেখলাম সত্যিই চাল না সাদা পাউডার বোঝা মুশকিল। প্রশ্ন করলাম একশো দিনের কাজের কথা। বললো অক্টোবর থেকে তিন দফা কাজ করে, এখনও কেউ একটা পয়সাও পায় নি। অসহায় ভাবে বলছিল বাগান মালিকের বকেয়া টাকাগুলিও যদি উদ্ধার করে দিত সরকার তাহলে অনেকটা সুরাহা হত। অসুস্থ হলে ডাক্তার নেই, ঔষধ নেই—কি নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছে ওঁরা। একজন বললেন বিনা চিকিৎসায়-এর মধ্যেই মারা গেছেন ৮ জন।

প্রশ্ন করলাম বাগান বন্ধ হল জানলেন কীভাবে। অবাক হয়ে শুনলাম যে, ওঁরা কাজ করে চলেছিল নিয়মিতই, হঠাৎ একদিন জানতে পারল যে মালিক পালিয়ে গেছে। ঐ অসহায়, দুর্বল মানুষগুলির চোয়াল একবারই শক্ত হতে দেখেছিলাম, দেখেছিলাম চোখগুলি জ্বলে উঠতে। যখন চা বাগান খোলার দাবিতে ২৬টি সংগঠনের যৌথ আন্দোলনের প্রসঙ্গ তুলেছিলাম। বলেছিল যে ওঁরা বাঙালি, আদিবাসী, নেপালি

ঐক্যবদ্ধভাবেই আছে। এত অভাব অনটনও এই ঐক্য ভাঙতে পারেনি। অবাক হয়ে কথাটি শুনলাম আমরা। ওঁদের সাথে কথা না বললে এই শিক্ষাটা হয়তো হতো না। □

সুমিত ভট্টাচার্য,মানস কুমার বড়ুয়া, মানস কুমার দাস, আশিস মিত্র

দমবন্ধ করা পরিস্থিতির পরিবর্তনই আমাদের মূল লক্ষ্য

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

এই সময়ে খুব দ্রুততার সঙ্গে গোটা রাজ্য জুড়ে চা-বাগান শ্রমিক এবং তাঁদের পরিবারকে সাহায্য করার জন্য তহবিল সংগৃহীত হয়েছে। এই তহবিলকে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্য জুড়ে অসম্ভব ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে।

ইতিমধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলার মধু চা-বাগানের ৮৫২টি পরিবারের হাতে রান্নার সামগ্রী এবং ৪৭২ জন ছাত্র-ছাত্রীর হাতে পঠন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে আলিপুরদুয়ার জেলার কর্মীরা অত্যন্ত দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তীতে জলপাইগুড়ি জেলার একটি চা-বাগানেও সাহায্য নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। সংগঠন তহবিল সংগ্রহের কাজে বিপুল সাড়া পাওয়া গেছে।

উত্থাপিত প্রস্তাবের উপর প্রতিটি জেলা ও কলকাতার সাতটি অঞ্চল থেকে আলোচনা করা হয়। জেলাগুলি বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন করেছে। সংগ্রাম-আন্দোলনের সফলতা দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংগঠন এখন পর্যন্ত যে সফলতা অর্জন করেছে তা বক্তব্যে উঠে এসেছে। গোটা রাজ্য জুড়ে প্রশাসনের অভ্যন্তরে তীব্র নৈরাজ্য দেখা যাচ্ছে। ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে। কর্মচারীদের শারীরিকভাবে নিগ্রহ পর্যন্ত করা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও কর্মচারীদের বৃহৎ অংশ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পতাকাতলে আছেন। গত ২৯ ডিসেম্বর প্রতিটি জেলায় যে জেলা জমায়েতের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল তাও প্রতিটি জেলাতে সফলতা অর্জন করেছে। সংগঠন তহবিল এবং চা-বাগান শ্রমিকদের সাহায্যার্থে যে তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছে তা প্রতিটি জেলাতে কাঙ্ক্ষিত মাত্রা অর্জন করেছে। সাংগঠনিক কার্যকলাপসহ অন্যান্য যে ত্রুটি-দুর্বলতা এখনও রয়েছে তা অতি দ্রুত কাটিয়ে তোলার প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে প্রতিটি জেলার বক্তব্যে।

সবক'টি জেলা, কলকাতায় সাতটি অঞ্চল ও ২টি সহযোগী সমিতি থেকে মোট ২৭ জনের

আলোচনার পরবর্তীতে জবাবী ভাষণ দেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক অসিত ভট্টাচার্য।

জবাবী ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, কর্পোরেট পুঁজির সমর্থনপুষ্ট দক্ষিণপন্থীদের সব থেকে নিকৃষ্ট অংশকে নিয়ে গঠিত এই সরকার। লুম্পেন, চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও গুণ্ডাবাহিনী এই সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গোটা রাজ্য জুড়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। প্রশাসনের অভ্যন্তরেও সন্ত্রাস কায়েম হয়েছে। বদলিকে হাতিয়ার করে সংগঠন ভাঙ্গার চেষ্টা চলছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বসহ সমস্ত স্তরের নেতৃত্বকে বদলি করা চলছে। অনৈতিক বদলির বিরুদ্ধে স্থানীয়ভাবে প্রতিবাদের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। প্রশাসনে অসংখ্য শূন্যপদ সৃষ্টি হয়েছে অথচ স্থায়ী পদে নিয়োগ বন্ধ বহুদিন ধরেই। ফলে নতুন কর্মী পাওয়ায় সমস্যা তৈরি হয়েছে। একে মোকাবিলা করার জন্য একজন কর্মীকেই বহু ধরনের কাজ করতে হবে। আজকের দিনে সবচাইতে বেশি প্রয়োজন কর্মচারীদের সঙ্গে নিবিড় ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা। সমস্ত স্তরের কর্মী নেতৃত্বকে সমস্ত কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে হবে।

তিনি আরও বলেন এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সম্মুখীন আমরা। কেন্দ্রের সরকার এবং রাজ্যের সরকার দুটোই ফ্যাসিবাদী চরিত্রের। ফ্যাসিবাদী সরকারের যা যা বৈশিষ্ট্য থাকে, এই সরকারের সব আছে। আমরা অনেকে বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। কিন্তু আজকে এই প্রতারণা, তঞ্চকতা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। প্রতি মুহূর্তে মিথ্যাচার, কুৎসা প্রচার চলছে। মৌলিক উন্নয়নের বদলে প্রসাধনী উন্নয়নের কাজে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে।

অতি দ্রুত কিছু আদেশনামা প্রকাশ করা হয়েছে চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের প্রসঙ্গে। কিন্তু আদেশনামাগুলি খতিয়ে দেখলে এটা বোঝা যায় যে এই সরকার কতটা শ্রমিক কর্মচারী বিরোধী। তাই চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী যারা নিদারুণভাবে শোষিত, পীড়িত হচ্ছেন তাদের সংগঠিত করতে হবে এবং তাদের নিয়ে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। সেই কারণে অতি দ্রুত চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের তালিকা প্রস্তুতি প্রয়োজন।

আগামী রাজনৈতিক সংগ্রামকে কেন্দ্র করে আমাদের অসংখ্য কর্মসূচী নিতে হবে। প্রতিটি কর্মসূচীর লক্ষ্য থাকবে বেশি বেশি অংশের মানুষের কাছে আমাদের বক্তব্য পৌঁছে দেওয়া। যত বেশি সম্ভব মানুষের কাছে আমাদের পৌঁছোতে হবে।

রাজ্য সরকারের কাজকর্মের তিনি তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। তিনি বলেন অসংখ্য মিথ্যাচার আমাদের সামনে হাজির করছে। যার সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই। রাজ্যের শিল্পায়ন নিয়ে মিথ্যা প্রচার চলছে। অর্থ বিনিয়োগ না হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের আষাঢ়ে গল্প শোনাচ্ছে। গত ২০১৫ সালে শিল্প সম্মেলনে ঘোষণা হল ২ লক্ষ ৪৩ হাজার ১০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ আসছে, এবার আবার বলা হল আড়াই লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ আসছে, কিন্তু বাস্তবে কোথাও তার ন্যূনতম প্রতিফলন নেই। এবারের রাজ্য বাজেটে নতুন ধোকা দেওয়া হয়েছে জেশপ ও ডানলপ কারখানাকে রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করবে, যেটা কোনোমতেই সম্ভব নয়। শিল্পে বিনিয়োগের সমস্ত সূচকে আমাদের রাজ্য এখন অন্য সমস্ত রাজ্য থেকে পিছিয়ে পড়েছে। বেতন কমিশনে আরও একজন নতুন সদস্যকে যুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি ব্যক্তি, সংগঠন, সংস্থা প্রভৃতিকে ২০ ফেব্রুয়ারির পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে তাদের মতামত কমিশনকে জানাতে বলা হয়েছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী সমিতিগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তাদের মতামত বেতন কমিশনের কাছে জানাবে। রাজ্যের ভোট অন অ্যাকাউন্ট বিধানসভায় পেশ করা হয়েছে, কিন্তু কর্মচারীদের বকেয়া ইত্যাদি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বরাদ্দ বৃদ্ধি পায়নি। এই সময়কালে কেন্দ্রীয় করের অংশ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, আবার রাজ্যের সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণও বেড়েছে, কিন্তু আমাদের বকেয়ার পরিমাণও বেড়েছে। এই সরকার ইচ্ছা করলে আমাদের সমস্ত বকেয়া মিটিয়ে দিতে পারতো। তাই গোটা কর্মচারী সমাজের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে হবে নিজেদের দাবি অর্জনের জন্য এই সরকারের অপসারণ জরুরী। সভায় উত্থাপিত সমস্ত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

আগামী কর্মসূচী ঃ

(ক) বর্তমান বছরে সদস্য সংগ্রহের কাজকে অভিযান হিসাবে গ্রহণ করে পূর্ব বৎসরগুলির তুলনায় অধিক সদস্যভুক্তি করতে হবে।

(খ) সংগ্রামী হাতিয়ার, এমপ্লয়ীজ ফোরামসহ সমিতিগুলির নিজস্ব মুখপত্রের গ্রাহকভুক্তি বর্ধিত উদ্যোগ নিয়ে সম্পন্ন করতে হবে।

(গ) সময়ের চাহিদা অনুযায়ী চুক্তিতে নিযুক্ত কর্মচারীদের তালিকা তৈরি করে তাদের সংগঠিত করার কাজ করতে হবে।

(ঘ) ত্রৈমাসিক রিপোর্ট নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে।

(ঙ) ৮ মার্চ-এর আন্তর্জাতিক নারী দিবসের কর্মসূচী যথাযথ গুরুত্ব সহকারে পালন করতে হবে।

(চ) সমিতি দপ্তরে নিয়মিত উপস্থিতির হার বাড়াতে হবে।

(ছ) কমিটি ফাংশানিংকে আরও দ্রুত উন্নত করতে হবে। □

সাহায্য পৌঁছল শ্রমিকদের হাতে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নির্ধারিত সময়েই কর্মসূচী শুরু হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের অন্যতম সহ সভাপতি চুনীলাল মুখার্জী। শুরুতে সাধারণ সম্পাদক মনোজকান্তি গুহ খুব সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তারপর শুরু হয় ৮৫২টি বন্ধ চা বাগান শ্রমিক পরিবারকে কিচেন কিট্স বিতরণ। বিতরণ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন সাধারণ সম্পাদক মনোজকান্তি গুহ। এরপর একে একে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি বৃন্দ প্রত্যেকে অসহায় পরিবারগুলির প্রতিনিধিদের হাতে সামগ্রী তুলে দেন। সামগ্রী তুলে দেন সহ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ, চুনীলাল মুখার্জী, সুমিত ভট্টাচার্য, মানস কুমার বড়ুয়া, শিখা মুখার্জী, অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুতপা হাজরা, মানস দাস, প্রভঞ্জন ঘোষ, লিটন পাণ্ডে, অচিন্ত্য বিশ্বাস, আশীষ মিত্র, সুভাষ জানা এবং দীপক ঘোষ। এরপরে সামগ্রী বিতরণ করেন সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলা শাখার সম্পাদক প্রাণতোষ ধর সহ অন্যান্য জেলা নেতৃবৃন্দ। পার্শ্ববর্তী জেলার নেতৃবৃন্দ। একটু পরেই শুরু হয় ছাত্রছাত্রীদের পঠন সামগ্রী দেওয়াও। সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন হয়। কর্মসূচী শেষ হয় বেলা ৪টা নাগাদ। বন্ধ চা বাগান শ্রমিক পরিবারদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এই কর্মসূচী ঘিরে। বিভিন্ন মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমেও এই কর্মসূচীর সংবাদ প্রচারিত হয়েছে।

ঐ অসহায় বন্ধ চাবাগান শ্রমিকদের মুখে হাসি ফোটানোর এই শুভ উদ্যোগ কখনোই সফল হতো না, আলিপুরদুয়ার জেলার নেতা কর্মীদের নিরলস পরিশ্রম ছাড়া। জেলার সমগ্র নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীবৃন্দ অসম্ভব পরিশ্রম করে রাতদিন এক করে এই কর্মসূচীকে সফল করেছেন। এর সাথে যুক্ত হয়েছিলেন কলকাতা থেকে দুদিন আগে আলিপুরদুয়ার পৌঁছানো অচিন্ত বিশ্বাসের নেতৃত্বে তিন জনের কেন্দ্রীয় টিম। তাঁরাও অসম্ভব পরিশ্রম করেছেন। একটা সামগ্রিক টিম ওয়ার্ক এই কর্মসূচীকে চূড়ান্ত সাফল্য এনে দিয়েছে। কর্মসূচীর পর যখন বন্ধ চা বাগান শ্রমিক পরিবারের উজ্জ্বল হাসিমাখা মুখগুলিই বলে দিচ্ছিল এই কর্মসূচীর সাফল্য।

প্রতিটি কিচেন কিট্স্-এ যা ছিল—নুন—১ কিলোগ্রাম, সর্ষের তেল—১ কিলোগ্রাম, চিনি—১ কিলোগ্রাম, সয়াবিন—৫০০ গ্রাম। আমূল গুড়ো দুধ—২০০ গ্রাম। গুড়ো হলুদ—২০০ গ্রাম। ধনে—২০০ গ্রাম, গুড়ো লঙ্কা—১০০ গ্রাম। □

মানস কুমার বড়ুয়া

দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পাশে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হাতে চারটি বড় বড় খাতা ও দুটি কলম দেওয়া একটি করে প্যাকেট তুলে দেওয়ার কথা থাকলেও চাহিদার তুলনায় জোগান নির্দিষ্ট থাকায় তুলনায় ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের একটি দুটি করে খাতা দিয়ে উচ্চশ্রেণীতে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের হাতে বেশি সংখ্যক খাতা তুলে দেওয়া হয়। যেসব বাড়িতে রোজ হাঁড়ি চড়ে না, অপুষ্টিতে মৃত্যু হচ্ছে এক বা একাধিক পরিবারের সদস্যদের—সেখানে কন্যাশ্রীর সাইকেলে চড়ে ত্রাণ / সাহায্য নিতে আসাটা সবচেয়ে পীড়াদায়ক ব্যঙ্গ বলে মনে হচ্ছিল। মৃত্যুপথযাত্রী মানুষদের বেঁচে থাকার রসদ যোগানের (যা কিনা সরকারেরই প্রাথমিক কর্তব্য) পরিবর্তে চটকদারী বিজ্ঞাপন সর্বস্ব সাইকেল প্রদান দেখে কন্যাশ্রীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিজ্ঞাপনটির ছবি ধরা পড়ল। প্রতিদিন বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমে চা বাগান শ্রমিকদের জীবনযাত্রার যে ছবি ধরা পড়ে নিজে চোখে দেখে তা অনেক বেশি মর্মস্পর্শী ও বেদনাদায়ক বলে মনে হল। যেখানে মানুষের দুবেলা পেট ভরে খাবার জোটে না সেখানে বাড়ির ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়াটা একটা সাংঘাতিক রকমের চ্যালেঞ্জ। রোগা, হাড় জিরজিরে, সারা শরীরে অপুষ্টির চিহ্ন নিয়ে একদল খুদে থেকে কিশোর-কিশোরী পড়ুয়া এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এগিয়ে চলেছে। তাদের জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার লক্ষ্যে কিছুটা সহযোগিতা ও আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে লেখাপড়ার সরঞ্জাম তাদের হাতে তুলে দিতে পারায় আমরা গর্বিত। জানি এ লড়াই ওরা জিতবে, কারণ বাঁচতে গেলে ওদের জিততেই হবে। □

সুতপা হাজরা

প্রসঙ্গ ঃ শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য

‘দেখে শেখা না ঠেকে শেখা’

তর্কটা পুরোনো, তবে বর্তমানে তর্কটা সামনে চলে এসেছে। দেশের পরিস্থিতির সাথে সাথে রাজ্যের পরিস্থিতিতে যে ভয়ঙ্কর প্রবণতা এবং ধ্বংসাত্মক উদ্যোগ চলছে, মানুষকে চিন্তা চেতনায় পশ্চাদ্‌গামী করার, তারই প্রাথমিক বা বুনিয়াদী কার্যক্রম হলো প্রচলিত বিজ্ঞান নির্ভর আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে খতম করা। পাঠকবর্গ সহ সমাজের প্রতিটি মানুষই দেখছেন প্রতিদিন শিক্ষাক্ষেত্রে কি ধরনের সর্বনাশ হয়ে চলেছে। হতাশায় দীর্ঘশ্বাসও ফেলছেন শিক্ষিতজনেরা। কিন্তু অনেক ব্যথা যন্ত্রণার মাত্রা মেপে প্রকাশ করেও বলছেন, ‘কিন্তু ২০১৬ তে তো এরাই আসবে’। কাজেই অন্ধকারের শেষ কোথায়? এত কিছু দেখেও শিক্ষা হবে না?

আমরা রাজ্যের উচ্চশিক্ষা থেকে বুনিয়াদী শিক্ষা পর্যন্ত সর্বস্তরে যে মারণযজ্ঞ চলছে তার কিছু দিক এই নিবন্ধে রাখব ধারাবাহিকভাবে। এবং এত দেখেও শিক্ষা না হলে কী ভয়ঙ্কর ভাবে আমাদের অগ্রগতি ঠেকে যাবে তার কিছু কিছু লক্ষণও তুলে ধরবো। কারণ পড়াশুনার সাথেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত কাজ পাওয়ার সুযোগ—সেটা যে কোন অবস্থায় ঠেকেছে তা তো চুক্তির কর্মচারী, চুক্তির শিক্ষক, চুক্তির অধ্যাপক, চুক্তি পুলিশ ইত্যাদি ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা সবাই প্রতিদিন দেখছি। আজকের বিষয় উচ্চশিক্ষা।

উচ্চ শিক্ষাকে প্রথমে রাখছি কারণ সেদিন বাসে একজন সহযাত্রীর উচ্চকিত শব্দবাণে লেখকের ছোট্ট স্ন্যাপ ড্রিমটা হঠাৎ ভেঙে যায়। ভদ্রলোককে প্রায় ২০ বছর দেখছি, বাসের সহযাত্রী হিসাবে মুখ চেনা, টাইটেলটাও জানা, তবে ভদ্রলোককে চেনার থেকে বেশি জানি বলেই ঘটনাটা এখানে রাখছি। ভদ্রলোক প্রায় প্রতিদিন বাসে উঠে রাজ্যের পূর্বতন সরকারের একটা না একটা সমালোচনা (যা মূলত সংবাদপত্রের মুখরোচক পরিবেশনা গলাধঃকরণের পর বদহজমজাত শব্দবায়ু ভিন্ন কিছুই না।) না করে থাকতে পারতেন না। ভদ্রলোক উচ্চশিক্ষিত নামী সংস্থায় কাজ করেন, একমাত্র কন্যাকে উচ্চশিক্ষিতই করেছেন যে তখনকার সেক্টার ফাইভের চকচকে জীবনে সে অভ্যস্ত। চেহারায় একটা সুখী সুখী ভাব ভিড়ভাট্টা অসহ্য হলেও সরকারী বাসেই যাতায়াত করতেন, কারণ রুটটার কারসাজী—সব থেকে সস্তায় গন্তব্যে যাওয়া যায়, তবে সাথে কন্যাটি থাকলে ট্যাক্সিতে উঠে মুখটা একটু বিরক্তি বিরক্তি করে আমাদের দিকে চাইতেন বেশ অবজ্ঞা ভরেই। এ হেন ভদ্রলোক হঠাৎ সেদিন বলে বসলেন, ‘না এ রাজ্যটার আর কিচ্ছু হবে না। যে পরিবর্তন আশা করেছিলাম ফল হলো উল্টো। আগের সরকার যে খারাপ জায়গায় শেষ করেছিল এরা শুরুই করেছে তার থেকেও খারাপ ভাবে। যারা ও দলে ছিল দাদাগিরি করতো, তারাই এখন এ দলের দাদা... তারপর শেষ উক্তিটা হলো ‘কিন্তু ২০১৬-তেও এরাই আসবে।’

ভদ্রলোকের দীর্ঘশ্বাসের যথেষ্ট কারণ ঘটেছে, তার আশাভঙ্গ ঘটেছে, জিনিসপত্রের দাম কমেনি, মাইনে বাড়েনি, মেয়ে বেঙ্গালুরুতে বিয়ে হয়েছে, তবে সন্তানাদি বিষয়ে বড় জিজ্ঞাসা চিহ্ন, শারীরিক কারণ নয়, কারণটা চাকরিগত। রাজ্যের উচ্চ শিক্ষিতদের গর্ভগৃহ বিশ্ববিদ্যালয় যেগুলি গোটা বিশ্বের কাছেই সমাদৃত ছিল সেগুলিতে দখলদারী, পরিচালন ব্যবস্থায় দলবাজী ইত্যাদির ফলাফলে ধুঁকছে।

এটা কথার কথা নয়, সম্প্রতি যাদবপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সরকারি বরাদ্দ বন্ধ করেছে সরকার। বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রী বলছেন হিসাবপত্রের অপ্রতুলতার কথা। আর উপাচার্য মহাশয় যিনি ৯ বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকার পর এখানে এসেছেন, তিনি বলছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল ভেঙ্গেই ‘শিক্ষক কর্মচারীদের মাইনে দিতে হচ্ছে।’ একই অবস্থা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে উপাচার্য মহাশয়তো স্বয়ং দলীয় কর্মীর মতো কারবার করছেন। বারাসাতের রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দলবাজি করে মুখ পুড়িয়ে বর্তমানে মুখ রক্ষা করতে তদন্ত কমিটি বসিয়েছে সরকার। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়—যা অধ্যক্ষকে হেনস্থা এবং ‘ছোটো ছেলেদের কাজ’ বলে মুখ্যমন্ত্রীর বধাই পাওয়ার পর এমন নৈরাজ্যজনক অবস্থায় গেছে যে সেখানেও ভাবমূর্তি ফেরাতে একজন শাসক অনুগত ছাত্রনেতাকে জেলে রেখেছে পুলিশ, কোর্টও জেলে থাকার রায়ই দিয়েছে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্কুল লেবেল পর্যন্ত পরিচালন পর্ষদগুলিতে দখলদারী প্রতিষ্ঠা করার অন্যতম জঙ্গী ছাত্রনেতা শঙ্কুদেব পণ্ডাকে ১৯/১২/১৫ তারিখে সিবিআই জেরা করেছে এবং নথিপত্র জমা নিয়েছে। তারই ফলশ্রুতিতে ঐদিনই তাঁকে বর্তমান রাজ্য শাসক দলের সমস্ত পদ থেকে সরানো হয়েছে। এমনকি দলনেত্রীকে পিসি বলে ডাকা ঐ যুব নেতাকে তৃণমূলভবন থেকে জিনিসপত্র সমেত বের করে দেওয়া হয়েছে এসব সংবাদপত্রেই প্রকাশিত। ঐ ছাত্র নেতাকে সারদা কেলেঙ্কারির তদন্তে জেরা করা হচ্ছে। ঐ ছাত্র নেতার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে হঠাৎ হঠাৎ বিপুল টাকা ঢুকতো এবং হঠাৎ করেই তা নগদে তোলাও হত, এটুকু গোয়েন্দারা জেনেছেন বলে খবরে প্রকাশ। আর ভুক্তভোগীরা জানেন ঐ বিপুল অর্থের ব্যবহারের রহস্য। সারদা তদন্তের পূর্বে ঐ কাণ্ডের আইনজীবী (মহিলা) সল্টলেকের বাড়িতে খুন হওয়ার পর ঐ মহিলা আইনজীবীর স্বামীকে চুপ করানো হয়েছিল পুরস্কার স্বরূপ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় পদে বসিয়ে। সেই কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মিঃ হাংলু শেষমেশ অনেক ঝড় সামলে পদত্যাগ করে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গেছেন। কতজন গুণী শিক্ষক এরাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন তার হিসেব নেই। এসবই সরকারী তাণ্ডব চলছে উৎকর্ষতার নামে।

তার বিপরীতে টেকনো গ্রুপসহ ৭টি বেসরকারী সংস্থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য সরকার। সম্প্রতি এ বছরের চলতি শীতকালীন অধিবেশনে ব্রেনওয়ার সংস্থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়ে মোট ৮টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমেই আগামী দিনে উচ্চশিক্ষা কিনতে হবে এ রাজ্যের মানুষকে। আর এ রাজ্যের চুক্তি ভিত্তিতে কর্মরত উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপকেরা দীর্ঘ আন্দোলন, অনশন করে লাঠিপেটা খেয়ে সর্বশেষ ১০ ডিসে. ২০১৫ রাজ্য সরকার তাদের মাইনে ২২৭০০ টাকা থেকে সামান্য বাড়িয়ে ২৪৯৭০ টাকা করেছে আর কাজের চাপ বাড়িয়ে নিয়মিত অধ্যাপকদের সমান বা কখনও বেশি করা হয়েছে। প্রায় অর্ধেক মাইনেতে কাজ করতে বাধ্য হওয়া এই সমস্ত উচ্চশিক্ষিতরাও কি এটাই ভাবছে যে, ‘যাই হোক ২০১৬-তে এরাই জিতবে।’

সুবোধ সরকারের মতো কবি হয়তো চোরা পথে বিশেষ সুপারিশে ডক্টরেট পাচ্ছেন শাসকদলের আনুগত্যের পুরস্কার হিসাবে। কিন্তু উচ্চশিক্ষিত মানুষ যারা উচ্চ সংস্কৃতিরও ধারক বাহক সেই সমস্ত মানুষদের মর্যাদা বাড়ল না কমল? এটা ভাবার সময় এখনই নয় কি? আর ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহাশয় কি ভাবছেন? জানাবে সময়। এ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে বলে বিভিন্নভাবে যে প্রচার করা হচ্ছে তারই প্রেক্ষিতে একটি ছোট তথ্য দিতে হচ্ছে (উৎসাহী পাঠককে website দেখে নিতে অনুরোধ করছি)। এ রাজ্যে বর্তমানে (২০১৫ সালে ডিসেম্বর) মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩১টি। এর মধ্যে ২টি স্বাধীনতার আগে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত ৩০ বছরে হয়েছে ৮টি, ১৯৭৭ থেকে ২০১০ পর্যন্ত ৩৪ বছরে হয়েছে ১৮টি, ২০১১ থেকে ২০১৫ চার বছরে মাত্র ৩টি (এর মধ্যে) ১টি (টেকনো গ্রুপ) (বেসরকারি) অতি সম্প্রতি আরও ১টি (ব্রেনওয়ার সংস্থা) কে অনুমোদন বিল পাশ করেছে। আর এ রাজ্যে বর্তমানে সাধারণ ডিগ্রি কলেজ ৫০১টি। এর মধ্যে ‘ন্যাক’-এর প্রাথমিক শর্তপূরণ হয়নি ১১৩টি কলেজের। মাত্র ৭২টি কলেজের স্বীকৃতি আছে। প্রায় ২০৩টি কলেজ আগামীতে চালানো যাবে কিনা তা প্রশ্নের মুখে। আর এসব কলেজে পার্ট টাইম ক্লাস করা শিক্ষকরা অবস্থান বিক্ষোভ করলে লাঠি পেটা করা হয় (৫/১/১৬)।

বহুল প্রচারিত ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজগুলিতে আসন সংখ্যা ফাঁকা থাকার পরিমাণ ২০১১ থেকে প্রতি বছর বেড়েই চলেছে। বর্তমান বছরে সর্বোচ্চ মাত্রা ছুঁয়েছে। (তথ্য দিয়ে ভারাক্রান্ত করছি না, বিভিন্ন সংবাদপত্রের নেট ভার্সানে যে কেউ দেখে নিতে পারেন)।

সম্প্রতি এইসময় পত্রিকায় (৭/১/১৬) একটি তথ্যমূলক লেখা প্রচারিত হয়েছে। তাতে লিখছে যে কলকাতার নামী বেসরকারী স্কুলে প্রি নার্সারীতে ভর্তির ফি ২০১৪-১৫ সালের থেকে বর্তমান বছরে (২০১৫-১৬) বিপুল হারে বেড়েছে! ন্যূনতম ৩০,০০০ টাকা থেকে প্রায় ১,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ভর্তি ফি ঐসব স্কুলে। এছাড়াও অন্যান্য নানান কারণ দেখিয়ে অভিভাবকদের থেকে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করছে ঐসব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সরকারী যে ন্যূনতম নজরদারী পূর্বের সরকার চালু করেছিল সে সবই চুলোয় গেছে। এখন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সবই এক একজন দাদা বা দিদির অঙ্গুলি হেলনে চলছে, এটার ভুক্তভোগী আমরা সবাই। আর এসবের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলেই হাওড়ায় বালির বি.এড কলেজ জ্বালিয়ে দেওয়া (৬/১/১৬) মালদা কলেজের অধ্যক্ষের পদত্যাগ (৭/১/১৬), ইত্যাদি ঘটনা প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই দেখা যাচ্ছে। এমন একটি দিন নেই যেদিন এ রাজ্যের কোনো না কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মীরা আক্রান্ত বা হেনস্থার শিকার হচ্ছেন না। এই সমস্ত ভুক্তভোগীরা কি এটাই ভাবছেন যে, ‘যাই হোক ২০১৬-তে এরাই জিতবে’? প্রায় অর্ধেক মাইনেতে কাজ করতে বাধ্য হওয়া এই সমস্ত উচ্চশিক্ষিতরাও কি এটাই ভাবছেন যে, ‘যাই হোক ২০১৬—তে এরাই জিতবে।’ □

অশোক রায়

সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

এবং দখল করেছে। আবার যেখানে সম্ভব হয়নি সেখানে বোর্ড গঠনে বাধা দিয়ে পরিদর্শক নিয়োগ করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে। বিভিন্ন কারখানা, পোর্ট ইত্যাদিতে গায়ের জোরে ক্ষমতা দখল করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নস্যাৎ করে দিয়েছে। অতি সম্প্রতি প্রশাসনের সহায়তায় মুর্শিদাবাদের কান্দি পৌরসভা দখল করে নিতে দেখা গেল শাসক গোষ্ঠীকে। কান্দি পৌরসভা দখল করে এ রাজ্যে গণতন্ত্র ধ্বংসের এক নতুন নজির সৃষ্টি করলো এই শাসক দল। কান্দির ঘটনা আবারও প্রমাণ করলো শাসকদলের কাছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের কোনো মূল্য নেই। এই ঘটনা এ রাজ্যে গণতন্ত্র ধ্বংসের এক নতুন নজির তৈরি করলো তৃণমূল। আমরা দেখলাম আটমাস আগের নির্বাচনের ফলাফলে ১৩টি আসনে জয়ী হয় কংগ্রেস। বাকি ৫টি আসনের মধ্যে ৩টি পায় তৃণমূল, ২টি বাম সমর্থিত নির্দল। ভোটের এই ফলাফল পছন্দ হয়নি শাসকদলের। কংগ্রেসের নির্বাচিত ৬ জন কাউন্সিলরকে কিনে নেয় তারা এবং চেয়ারম্যান পদ দখলের লড়াইয়ে এক ধাপ এগিয়ে যায়। সমস্যা বাঁধে দু জন বাম সমর্থিত নির্দলকে নিয়ে। এই পরিস্থিতিতে ঐ দু জন কাউন্সিলর তাদের টার্গেটে পরিণত হয়। কারণ অনাস্থা প্রস্তাবে এদের সমর্থন তৃণমূল পাবে না বুঝতে পেরে দেবজ্যোতি রায়কে অপহরণ করা হয়। হাইকোর্ট নির্দেশ দিলেও পুলিশ তাঁকে খুঁজে বার করেনি। ফলে ঐ কাউন্সিলরের অনুপস্থিতিতে এক ভোটের ব্যবধানে চেয়ারম্যান পদ দখল করে শাসক দল। এই বেআইনী পৌরসভা দখলের পর, একদিন বাদে উদ্ধার হন অপহৃত কাউন্সিলর। প্রশাসনের ভূমিকাকে তীব্র ভর্ৎসনা করে সম্প্রতি হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন রায়ে এভাবে নির্বাচিত চেয়ারম্যানকে দায়িত্বভার গ্রহণ না করার ও সমস্ত রিপোর্ট জমা দেবার কথা বলা হয়েছে।

কান্দি পুরসভার বে-আইনি দখল আসন্ন নির্বাচনের আগে গোটা রাজ্যবাসীর কাছে কিন্তু বিপদজনক বার্তা দিচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে জনমতের প্রতিফলন কোনোভাবেই চাইছে না শাসক দল। মানুষের রায়কে ভয় পাচ্ছে এরা। সেই কারণেই চলছে ছলে বলে কৌশলে যেনতেনপ্রকারেণ নির্বাচিত সংস্থা দখলের কাজ। মনে রাখতে হবে শাসক দলকে, জনগণের মতকে গায়ের জোরে দমিয়ে রাখা যাবে না। সত্যের জয় হবেই। □

সুগত দাস

শিল্পের হাল হকিকৎ

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

তথ্য-প্রযুক্তি, হোটেল তৈরিতে বিনিয়োগের প্রস্তাব। গত এক বছরে রাজ্যবাসী এর একটা প্রকল্পের বাস্তবায়নের সূচনা দেখতে পায়নি।

অথচ ২০১১ পূর্ববর্তী কুড়ি বছরে পশ্চিমবঙ্গে, শিল্প ক্ষেত্রে চিত্রটা এমন হতাশজনক ছিল না। রাজ্যে শিল্প সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলি দ্রুত বিকশিত হচ্ছিল। ১৯৯১-২০০০ সালে রাজ্যে বিনিয়োগ হয়েছিল ১৭ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা; আর ২০০১-২০১০ সালে এর পরিমাণ ৪৮ হাজার ১০৪ কোটি টাকা। শুধু শেষ দশ বছরে নতুন তৈরি শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৭২টি। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে ‘পরিবর্তনের’ সরকারের আমলে এই ছবিটা একেবারেই ঝাপসা হয়ে গেছে। গত পাঁচ বছরে রাজ্যে বিনিয়োগ হয়েছে মাত্র ৬ হাজার ৮৭১ কোটি টাকা। অর্থাৎ বছরে মাত্র ১ হাজার ৩৭৪ কোটি টাকা। শিল্প সম্মেলনের আগে সম্প্রতি শালবনীতে জিন্দালের একটা সিমেন্ট কারখানার শিলান্যাস করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যাতে বিনিয়োগ হবে ৫০০ কোটি টাকা। প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হবে মাত্র ২০০ জনের। প্রসঙ্গত, বিগত সরকারের আমলে জিন্দালদের প্রকল্পে বিনিয়োগের প্রস্তাব ছিল ৩৫ হাজার কোটি টাকা। কর্মসংস্থান হত প্রায় ২০ হাজার লোকের। সেই সময়, বর্তমান সরকারে আসীন রাজনৈতিক দল এই প্রকল্প নির্মাণে বাধা দেয় এবং ক্ষমতায় এসে তা বাতিল করতে সক্রিয় ভূমিকা নেয়। সুতরাং একটি ক্ষুদ্র প্রকল্পের শিলান্যাস যে শিল্প সম্মেলনের আগে নিজের প্রচারে কেরামতি ছাড়া আর কিছুই নয় তা বুঝতে রাজ্যবাসীর খুব একটা অসুবিধা হবে না।

সরকারের মিথ্যাচার আজও অব্যাহত। এবারের শিল্প সম্মেলনের পর যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সাগরে বন্দর, জাতীয় সড়ক প্রকল্প, দেওচা-পাচামির মতো বিগত বছরের তালিকার পুনর্মুদ্রণ ঘটেছে। হলদিয়া বন্দর সম্প্রসারণের ৪ হাজার কোটি টাকার কেন্দ্রীয় সরকারের বিনিয়োগের প্রস্তাবের যে উল্লেখ রয়েছে তা ২০১৪ সালের ঘোষিত প্রকল্প। ন্যাশনাল অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক বিনিয়োগের যে ৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকার কথা বলা হয়েছে সেই প্রকল্পের কাজ বহুদিন ধরে চলছে রাজ্যে। এছাড়াও এসেল গ্রুপের ১৫ হাজার কোটি টাকা, রর্গা পাম্পড স্টোরেজ প্রকল্পে ৫ হাজার ২০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের যে প্রস্তাব এসেছে বলে সরকার দাবি করছে তা কয়েক বছর পুরনো। এইসব প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে রাজ্য সরকার নিশ্চুপ। আবার টি সি জি গ্রুপের ২০ হাজার কোটি টাকার এবং নিরঞ্জন হিরানন্দানির এইচ-এনার্জি পাইপ লাইনের প্রকল্পে ৩ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব তালিকায় রয়েছে। এই প্রস্তাব অনেক আগেই বাতিল হয়ে গেছে।

সবচেয়ে বড় প্রতারণা হচ্ছে বেকারদের সাথে। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করছেন এই শিল্পায়নের ফলে ৬৭ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান হয়েছে। এই সংখ্যার হিসাবে রাজ্যের প্রতি বুথ অঞ্চলে অন্তত ৮৮ জন বেকারের কর্মসংস্থান হওয়ার কথা। রাজ্যবাসী আতস কাচ দিয়েও এই ৮৮ জনকে খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই আগামী দিনের গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটানোর মধ্য দিয়েই রাজ্যে একটি সুন্দর শিল্প বান্ধব পরিবেশ ফিরিয়ে আনা যাবে। □

মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী

সামনে দিন জোর লড়াই

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর)

কর্মচারীরা চির বঞ্চিত থাকবেন। অন্যান্য অর্জিত অধিকারগুলি একে একে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। বঞ্চনার বিরুদ্ধে ধর্মঘট করলে বেতন কাটছে এবং চাকরিকাল কমিয়ে দিয়েছে। এক কথায় স্বৈরাচারী দমননীতি চলছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি প্রতিনিয়ত আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে রয়েছে। তার চাপেই গত ২৭ নভেম্বর ২০১৫ পে-কমিশন ঘোষণা হয়েছে। গত ২০ ফেব্রুয়ারি কমিশন বিজ্ঞপ্তি জারী করেছে ৯০ দিনের মধ্যে সংগঠনগুলিকে মেমোরান্ডাম জমা দিতে হবে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে ১১ জানুয়ারি তারিখ কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে পত্র দিয়ে মূল বেতনের ২৫ শতাংশ ইন্টারিম রিলিফ দাবি করা হয়েছে (যেটা ন্যূনপক্ষে ২০০০ টাকা)। পেনশনার্সদের জন্য ২৫ শতাংশ ইন্টারিম এবং ন্যূনতম ১০০০ টাকা দাবি করা হয়েছে। সাথে অর্থ সচিবকে ১১ জানুয়ারি পত্র দিয়ে পঞ্চম বেতন কমিশনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ ষষ্ঠ বেতন কমিশনের বিচার্য বিষয়ের মধ্যে যুক্ত করতে দাবি জানানো হয়েছে। সমিতিগুলিকে তাঁদের ক্যাডার সম্পর্কে বক্তব্য স্থির মেমোরান্ডাম তৈরি করতে বলা হয়েছে।

আমাদের একটু স্মরণে রাখা ভালো যে, রাজনৈতিক পরিস্থিতি যদি অনুকূল না হয় তাহলে অর্থনৈতিক দাবি আদায় হয় না। উল্টে অর্জিত অধিকারগুলি খর্ব হয়। কেন্দ্রীয় চতুর্থ বেতন কমিশন, পঞ্চম বেতন কমিশন এবং ষষ্ঠ বেতন কমিশন এই তিনটি বেতন কমিশনের গ্রোথ সবচাইতে বেশি, এই তিনটি বেতন কমিশনের সময়কালে বামপন্থীদের কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকাতে কর্মচারীরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছে। কেন্দ্রীয় ষষ্ঠ বেতন কমিশনে গ্রোথ হয়েছিল ৫৩ শতাংশ (সর্বোচ্চ)। কিন্তু সপ্তম বেতন কমিশনের গ্রোথ হয়েছে মাত্র ১৪ শতাংশ (সর্বনিম্ন)। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা আগামী মার্চ মাস থেকে লাগাতার ধর্মঘটে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমাদের বেতন কমিশনে গ্রোথ হয়েছিল ৩৩ শতাংশ। আমরা বেতন কমিশনের কাছে আমাদের মেমোরান্ডাম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দেব। ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। আমাদের বোঝাবুঝি স্পষ্ট যে, বর্তমান সরকার এই সময়কালে সরকারী কর্মচারীদের জন্য এমন কোনো কাজ করেনি যে সরকারের উপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখা যায়।

এখন যতটুকু যা ঘোষণা হচ্ছে সবটাই নির্বাচন মাথায় রেখে। নির্বাচনের পর প্রকৃত অবস্থান ঠিক হবে যে নিয়োগকর্তা ক্ষমতায় আসবে তার শ্রেণী নীতির উপর ভিত্তি করে। ৪৪+৬=৫০ শতাংশ ডি.এ বকেয়া অথচ ২৬/২/১৬ তাং ভোট অন অ্যাকাউন্টে সরকারী কর্মচারীদের জন্য কোনো অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। বিগত বামফ্রন্ট সরকার যখন ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ করে তখন সরকারী কর্মচারীদের মাত্র ১৬ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া ছিল, তার মধ্যে ১০ শতাংশ মহার্ঘভাতার অর্থের সংস্থান ঐ ভোট অন অ্যাকাউন্টে বরাদ্দ ছিল। পরিবর্তনের সরকার এসে বরাদ্দকৃত ১০ শতাংশ ডি.এ দিয়ে দিত তাহলে মাত্র ৬ শতাংশ মহার্ঘভাতা বকেয়া থাকতো। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্যি পরিবর্তনের সরকার আমাদের ডি.এ বরাদ্দ টাকা মেরে দিয়েছে এবং বকেয়া রাখতে রাখতে স্বনামধন্য শিল্পপতিদের সংগঠন ফিকির চেয়ারম্যান সেটাকে ৫০ শতাংশে নিয়ে গিয়ে বিশ্বায়নের নীতি অনুযায়ী কার্যত বেতন সঙ্কোচনে পরিণত করেছে। এই আর্থিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে আমাদের যথাযথ ভূমিকা নিতে হবে। আমাদের পরিবার-পরিজনের কাছে বঞ্চনার কথা তুলে ধরতে হবে। কেননা আমাদের আয়ের উপর পরিবারের ভালো থাকা, মন্দ থাকা নির্ভরশীল। এর ভাগ পরিবারের সদস্যরা ভোগ করে পরোক্ষভাবে তাঁরাও বঞ্চিত হচ্ছে। তাঁদেরও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শামিল করতে হবে। সামনে দিন জোর লড়াই, পরিস্থিতির পরিবর্তন ছাড়া মুক্তি নাই। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
44th Year, 10th Issue, February 2016

Regd. No. : 18484/71
Price : One Rupee

পঞ্চম জাতীয় মহিলা কনভেনশন

পৃথক রাজ্যের দাবিতে তেলেঙ্গানাবাসীর দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রাম বিফলে যায়নি। ২০১৪ সালের ২ জুন তেলেঙ্গানা একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। তেলেঙ্গানার অন্যতম প্রধান শহর ওয়ারাঙ্গালের NIT অডিটোরিয়ামে পঞ্চম জাতীয় মহিলা কনভেনশন ২৩-২৪ জানুয়ারি ২০১৬ উৎসাহ, উদ্দীপনার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল। রাজ্য প্রশাসনের সক্রিয়, আন্তরিক সহযোগিতায় কনভেনশন সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের উনিশটি রাজ্যের মোট ৫২৪ জন মহিলা প্রতিনিধি এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন। আমরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে ২৩ জন মহিলা প্রতিনিধি এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলাম।

২৩ জানুয়ারি কালেক্টরেট বিল্ডিং থেকে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত মহিলা প্রতিনিধিগণ এক বর্ণাঢ্য বিশাল মিছিল করে অডিটোরিয়ামে প্রবেশ করেন। মিছিলের সামনে ছিল একাধিক সুসজ্জিত ট্যাবলো এবং রাস্তার দুপাশে অজস্র মানুষের ভীড়। স্লোগানে স্লোগানে মিছিল উচ্চকিত ছিল। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের চেয়ারম্যান আর মুথুসুন্দরম বেলা সাড়ে এগারোটায় পতাকা উত্তোলন করেন এবং AISGEF-এর অন্যান্য নেতৃবৃন্দ শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন। তারপরই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। আর মুথুসুন্দরম্ সভাপতির ভাষণ দেন। এর পরে অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান জি সুব্বারাও কনভেনশনে আগত সব নেতৃবৃন্দ, অতিথিবৃন্দ ও প্রতিনিধিকে অভ্যর্থনা জানান। কনভেনশনের উদ্বোধনী ভাষণে তেলেঙ্গানার সাংসদ শ্রীমতী কে কবিতা বলেন, ''তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী দুঃখ করেন যে এখন দেশের বেশিরভাগ কর্মচারী চুক্তিপ্রথায় নিযুক্ত হচ্ছেন, তাহলে প্রধানমন্ত্রীও কেন এই প্রথার আওতাধীন হবেন না? তেলেঙ্গানার চুক্তিপ্রথায় নিযুক্ত কর্মচারীদের স্থায়ী করার জন্য নোটিশ জারি করা হয়েছে। ২০০৪ সাল থেকে যে নতুন পেনশন বিল লাগু হয়েছে আমরা তার বিরোধিতা করছি এবং পুরোনো পেনশন ব্যবস্থায় ফিরতে চাই। মহিলাদের আয়কর ছাড় ছয় লাখ করার আবেদন জানাচ্ছি।''

রাজ্যের মুখ্যসচিব রাজীব শর্মা বক্তব্য রাখেন। এরপর সাংসদ শ্রীমতী গুণ্ডু সুধারানী এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্য পেশ করেন।

পরবর্তীতে AISGEF-এর সাধারণ সম্পাদকের উত্থাপিত প্রস্তাবানুসারে কনভেনশনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সভাপতিমণ্ডলী, স্টিয়ারিং কমিটি, মিনিটস কমিটি এবং ক্রেডেনশিয়াল কমিটি গঠিত হয়।

রঞ্জনা নেরুলা, কোষাধ্যক্ষ সিআইটিইউ, তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ''গত পঁচিশ বছর ধরে নয়া উদারীকরণের নীতির ফলে সারা ভারতে অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়ছে। যেখানে দেশের ৩০ শতাংশ শিশু এখনও অপুষ্টিতে ভোগে, বেশিরভাগ মানুষ আন্ডার ক্যালোরি সেখানে দেশের ৫০ শতাংশ সম্পত্তির মালিক কেবলমাত্র ৬২ জন। দেশের ৮০ শতাংশ মহিলাই গার্হস্থ্য হিংসা, শ্লীলতাহানি, নির্যাতন অথবা ধর্ষণের শিকার। বিবাহিত মহিলাদের Unpaid labour ভাবা হয়, যে মহিলারা বাইরের কাজে যান তাঁরাও বাড়ির পুরুষদের কাছ থেকে সাংসারিক কাজে সহযোগিতা পান না। দেশের ষোল লক্ষ আশা এবং অঙ্গনওয়ারী কর্মচারী যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশের মাতৃমৃত্যু এবং শিশুমৃত্যুর হার কমছে সেখানে তাদের বেতন এবং চাকুরীগত নিরাপত্তা অপ্রতুল। তাই সংগঠিত অংশের মহিলাদের আরও বেশি করে সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে।''

এরপরে কলাই সেলভি বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী মৃণালিনী সরাভাই, রোহিত ভেমুলা এবং অগণিত সাধারণ মানুষ যারা সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে নিহত হয়েছেন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁদের উদ্দেশে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন এবং তাদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

পরে প্রতিনিধি অধিবেশন শুরু হয়। আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পরিস্থিতির উপর পেশ করা সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টটি হিন্দীতে সবিতা এবং ইংরাজীতে রত্না সরকার পেশ করেন।

হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং ABVP গৃহীত অনৈতিক এবং বৈষম্যমূলক আচরণ যা রোহিত ভেমুলাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে তার বিরুদ্ধে আর মুথুসুন্দরম একটি প্রতিবাদ প্রস্তাব পেশ করেন।

সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্টটিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বিশদভাবে আলোচনা করা হয় এবং কনভেনশন আগত মহিলা প্রতিনিধিদের মূলত তার ওপর আলোচনা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

(১) ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস। (২) ভারতের মহিলা কর্মীদের সঙ্কটপূর্ণ অবস্থান। (৩) জাতীয় পরিস্থিতি। (৪) ২ সেপ্টেম্বর ২০১৫-র সাধারণ ধর্মঘট------। (৫) সাম্প্রদায়িকতা। (৬) ICDS, NRHM, মিড ডে মিল প্রভৃতি প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী কর্মীদের অবস্থান। (৭) লিঙ্গ বৈষম্য, জাতপাত, ধর্মীয় বৈষম্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে গৃহীত কেন্দ্রীয় সরকারী নীতি। (৮) বিশাখা গাইড লাইন্স। (৯) মহিলাদের কর্মচ্যুতি। (১০) ৭ম কেন্দ্রীয় পে কমিশনের পেশ করা কর্মচারী বিরোধী প্রস্তাব। (১১) মহিলা সাব কমিটি গঠন এবং তার কার্যকলাপ।

এই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ২৩ এবং ২৪ জানুয়ারি ১৯টি রাজ্যের মোট চৌত্রিশ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। এই আলোচনা পর্বটি ছিল প্রাণবন্ত। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ রাজ্যে মহিলাদের সমস্যা এবং তার বিরুদ্ধে মহিলাদের লড়াই সংগ্রামের কথা বলেন। কেরলের প্রতিনিধি বলেন, যে তাদের রাজ্যের নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন, আশা ও অঙ্গনওয়ারী কর্মীরা বেতন বৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম করেন। কারণ একে অপরের বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াইতে অংশগ্রহণ করতে না পারলে অভীষ্ট ফল লাভ হবে না। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি জাতপাত, ধর্ম সমস্ত বৈষম্যকে দূরে সরিয়ে রেখে সমাজের সমস্ত অংশের মহিলাদের অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি, নারী নিগ্রহের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শামিল হবার আহ্বান জানান।

কনভেনশনে বক্তব্য রাখছেন পশ্চিমবাংলার প্রতিনিধি কাকলি পাল।

প্রথম দিনের অধিবেশনের সমাপ্তির পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

২৪ জানুয়ারি Social Economist প্রফেসর চান্দ্রা বর্তমান পরিস্থিতিতে কর্মরতা মহিলাদের সমস্যাগুলি নিয়ে একটি অসাধারণ বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন, যে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি পৃথিবী জুড়ে শ্রম আইন পরিবর্তনের মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রটিকে সঙ্কুচিত করার চেষ্টা করছে। মহিলাদের নিরাপত্তাও কমছে এবং নারী নির্যাতনের ঘটনা ক্রমবর্ধমান। তিনি ধর্মীয় মৌলবাদ এবং জাতপাত ভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মহিলাদের একটি বিকল্প ব্যবস্থা গঠনে প্রয়াসী হবার আহ্বান জানান।

প্রতিনিধিদের আলোচনার শেষে সাধারণ সম্পাদক এস শ্রীকুমার জবাবী ভাষণ দেন। তিনি বলেন, আজ পর্যন্ত মহিলা কর্মচারীরা যেসব অধিকার অর্জন করেছেন তা সবই আদায় হয়েছে আপসহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। এখন সরকারী দপ্তরগুলিতে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ক্রমশ কমছে, কাজেই সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে নতুন করে ভাবতে হবে। সাংগঠনিক কাজে মহিলাদের আরও বেশি করে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ওপর দিক নির্দেশ করেন।

ওয়ারাঙ্গালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম মহিলা কনভেনশন নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করে।

(১) মহিলাদের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি, নির্যাতন বন্ধ করা।

(২) নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি রোধ এবং গণবণ্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সংগ্রাম গড়ে তোলা।

(৩) বিশ্বায়ন, বেসরকারীকরণ, উদারীকরণ-এর জনস্বার্থ বিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তোলা।

(৪) জাতপাত ভিত্তিক শোষণ, কুসংস্কার, নিপীড়নমূলক ধর্মীয় প্রথা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ।

পঞ্চম মহিলা কনভেনশন নিম্নলিখিত দাবিগুলি গ্রহণ করে।

(১) মহিলাদের জন্য সমানাধিকার, উন্নয়ন ও শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করা।

(২) মহিলাদের বক্তব্য এবং তাদের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া।

(৩) মহিলাদের ওপর সর্ববিধ বৈষম্যমূলক আচরণের নিরসন ঘটানো।

(৪) মহিলাদের অগ্রগতি, ক্ষমতায়ন, চিন্তার স্বাধীনতা এবং সমাজে তাদের অবদানকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা।

(৫) সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জায়গায় মহিলাদের অবস্থানকে নিশ্চিত করা।

(৬) সামাজিক এবং সাংসারিক দায় দায়িত্ব নারী পুরুষ সমানভাবে পালন করা।

(৭) সমস্ত কর্মচারীদের পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, মেডিক্যাল বেনিফিটস এবং অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষাকে নিশ্চিত করা।

(৮) পার্লামেন্টে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ করা।

(৯) সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

(১০) প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে "Sexual harassment of women at work place (Prevention, Prohibition and redressal) Act. 2013" অনুসারে Internal complainty committee গঠন করা।

(১১) সমস্ত মহিলা কর্মচারীদের জন্য child care leave-এর সুযোগ তৈরি করা।

সর্বশেষে এই কনভেনশন সমস্ত মহিলা কর্মচারীদের কাছে আবেদন জানিয়েছে যে, আজ দেশের শ্রমজীবী মানুষ শাসক শ্রেণীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষ এবং মহিলাদের ঐক্যকে ধ্বংস করার জন্য জাতপাত, ধর্ম, লিঙ্গ বৈষম্যকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমস্ত শক্তিকে সংহত করে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং উদার অর্থনীতি যা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে নিম্নমুখী করছে তার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে। □

কাকলি পাল

দিল্লীতে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ধরনা অবস্থান

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বানে ''দশ দিবস কী সামূহিক ধরনা'' কর্মসূচী যন্তর-মন্তরে পালন করলেন বিভিন্ন রাজ্যের সরকারী কর্মচারীরা। সপ্তম বেতন কমিশনের নেতিবাচক এবং হতাশাজনক সুপারিশের বিরুদ্ধে এবং ন্যূনতম ২৬০০০ টাকার বেতনসহ নিম্নবেতনভুক কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের দাবিতে লাগাতার ৮ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি দশ দিন ধরে সাড়া জাগানো কর্মসূচী পালিত হল—

৮ ফেব্রুয়ারি—হরিয়ানা ও কর্ণাটক। ৯ ফেব্রুয়ারি—পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র। ১০ ফেব্রুয়ারি—উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাব। ১১ ফেব্রুয়ারি—জম্মু ও কাশ্মীর / ওড়িশা। ১২ ফেব্রুয়ারি—ঝাড়খণ্ড, উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থান। ১৫ ফেব্রুয়ারি—বিহার, উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা। ১৬ ফেব্রুয়ারি—পশ্চিমবঙ্গ ও পাঞ্জাব। ১৭ ফেব্রুয়ারি—ছত্তিশগড়, চণ্ডীগড় এবং মহারাষ্ট্র জিলা পরিষদ। ১৮ ফেব্রুয়ারি—কেরালা, তামিলনাড়ু, হিমাচল প্রদেশ ও অন্যান্য উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলি। ১৯ ফেব্রুয়ারি—কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও তেলেঙ্গানা।

প্রত্যেকদিন বেলা ১০টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত লাগাতার ধরনা-অবস্থান চলে। পার্শ্ববর্তী রাজ্যের শয়ে শয়ে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা এই ধরনা অবস্থানে অংশ নেন। মূলত পাঁচদফা দাবিতে এই কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। দাবিগুলি হল—১। সপ্তম বেতন কমিশনের কর্মচারী স্বার্থ-বিরোধী সুপারিশসমূহ বাতিল কর, ২। প্রদানমূলক পেনশনস্কীম বাতিল করে সংজ্ঞায়িত পেনশন স্কীম সকলের জন্য সুনিশ্চিত কর, ৩। সরকারী চাকরি থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার কর, ৪। চুক্তি প্রথায় ক্যাজুয়াল কর্মী নিয়োগ বন্ধ কর এবং কর্মরত এই সকল কর্মীদের নিয়মিতকরণ কর, ৫। আয়কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বাড়াও।

দশদিন ব্যাপী এই ধর্ণায় সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার, চেয়ারম্যান আর মুথুসুন্দরম, সহ-সম্পাদকদ্বয় শ্রী সুভাষ লাম্বা ও শ্রী মঞ্জুল কুমার দাস, শ্রী মনোজকান্তি গুহ সহ অন্যান্য রাজ্য নেতারা বক্তব্য রাখেন।

দিল্লীতে ধর্নায় অংশগ্রহণকারী পশ্চিমবাংলার প্রতিনিধিরা

পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রী মনোজকান্তি গুহের নেতৃত্বে একটি দল ১৬ ফেব্রুয়ারি মিছিল করে এই ধরনায় অংশ নেন। ঐদিন সভায় সভাপতিত্ব করেন মঞ্জুল দাস, মনোজকান্তি গুহ এবং শুকদেব সাইনিকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। এই দিনের সমাবেশে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে সাধারণ সম্পাদক মনোজকান্তি গুহ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন শিখা মুখার্জী। সুতপা হাজরা ও মানস কুমার বড়ুয়া। এছাড়াও সংগঠনের দুই সহ-সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী এবং বিজয় শঙ্কর সিংহসহ অন্যান্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

১৮ ফেব্রুয়ারি এ শ্রীকুমারের নেতৃত্বে সংগঠনের সর্বভারতীয় একটি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে দাবিসংবলিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। □

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ওয়েবসাইট ঃ **www.statecoord.org**
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।